# চিররূপা

সন্তোষকুমার ঘোষ

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক : শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রী বিনয় সাহা

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৬৬, নভেম্বর ১৯৫৯

দাম : তিন টাকা

মুদ্রক : শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

রূপদর্শী গৌরকিশোর ঘোষ-কে

# সূচী

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

# মনসিজা

তুমি আমাকে দু-বার আঘাত দিয়েছ। একবারের কথা তুমি জানো, সেই প্রথম যৌবনে, না না, শেষ কৈশোরে। আরেকবারেরটা জানো না, এই সেদিন, প্রৌঢ়তার প্রান্তরে নামিয়ে দিয়ে যৌবনের তরী চিরদিনের মতো যখন ফিরে গেছে। অনেক, অনেকদিন পরে তোমাকে যেদিন আবার দেখলুম।

দুটি আঘাতের কথাই আজ লিখব।

কত লোকের কত কথাই তো এতদিন ধ'রে লিখেছি, কিন্তু তোমাকে নিয়ে কখনও কিছু লেখা হয়নি, এই ক্ষোভ আমার বহুদিনের। চেষ্টা যে করিনি, তা নয়। করেছি। কিন্তু এক লিখতে আর হয়েছে। স্মৃতির পাতার আড়ালে রাখা একটি বেদনার পাপড়িকে সকলের সমুখে খুলে ধরা তো সহজ নয়। লজ্জা যত, অস্বস্তিও তত।

দেখ, একদিন ওই পাপড়ি রক্ত-রং ছিল। সে-রং আমার বাসনার। তার গন্ধও ছিল। সে-গন্ধ দেহমোহের। রং ঘুচেছে, গন্ধ গেছে ব'লেই ভেবো না, পাপড়িটার দামও কমেছে। কমেনি। রোজ সব কাজ সারা হ'লে, সব আলো নিবে গেলে খাতার পাতা খুলে সেই পাপড়িটা দেখতুম যে। কোনোদিন বা শুধু আঙুল দিয়ে তাকে ছুঁয়ে দেখতুম। আছে কিনা। এই 'আছে' কথাটা যেই সমস্ত সত্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত, অমনই তাকে মুড়ে ঢেকে রাখতুম। রোজ।

এতদিন তাই ঢের ছিল। একটি দুঃখকে ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে-জুড়িয়ে সুখস্বাদ ক'রে নিয়েছিলুম। ধোঁয়া আর কালি তো কবেই ফুরিয়েছিল,

জ্বালাটুকুও নিবে আসছিল, তুমি আবার নতুন ক'রে একটি দুঃখ জ্বালালে। আবার কেন তোমাকে দেখলুম।

তাই তোমার কথা না লিখে আজ আমার উপায় নেই। এ আমার একটা কৃত্য, আমার দায়। মুক্তি।

· নইলে, আমি ঠিক জানি, আজ যা লিখছি, সেটা যা হোক তা হোক, গল্প হবে না। অনেক গল্প যেমন জীবন-ছাড়া, অনেক জীবনও তেমনই গল্প-ছুট। আশঙ্কা করি, আমার জীবনও তাই। তবু লিখছি, কেননা আমি বিশ্বাস করি, লেখা হওয়াটাই আসল কথা, গল্প হ'ল কি না হ'ল সেটা পরের।

গল্প নয় ব'লেই তো 'আজ আমার জ্বর' প্রথমেই এই অবান্তর কথাটা লিখতে পারলুম।

আজ আমার জ্বর। অতএব অফিসে যাব না।

এ-জ্বর সে-জ্বর নয়, যা আসঙ্গাতুর, সবলা নারী ; অসহায় প্রবীণ পুরুষের উপরে বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছেয়ে ফেলে, ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গ্রাস করে। নিষ্ঠুর থাবায় পলকা ডালের মতো থরথর একটা শরীরকে থেকে-থেকে কাঁপায়, তার চেতনাকে মুঠোয় পাওয়া পিঁপড়ের মতো পিষে মারে।

আমার আজকের এ-জ্বরের তুলনা অন্য। জ্বর নয়তো, যেন ছোটো নদী। তিরতিরে। ফণা নেই, ফেনা নেই, পাড় ভাঙে না, ঢেউ তোলে না। তার টলটলে জলে শুধু ডুব দিতে হয়। সাঁতার দিয়ে যেতে হয় যত-দূর খুশি। দম নিতে মাঝে-মাঝে মাথা তুললে মনে হয়, সব কেমন সীসে-সীসে, ভারি-ভারি। চোখ ছলছল, একটু যেন জ্বালাও করে।

এইরকম একটা জ্বরের মধ্য দিয়েই একদিন তোমার খুব কাছে এসেছিলাম। কথাটা হঠাৎ খেয়াল হ'ল ব'লেই ভূমিকায় আজকের

জ্বরের উল্লেখ করতে হয়েছে। ঘটনাটা কতদিন আগেকার বলো তো? আঠারো বছর, না কুড়ি?

জিজ্ঞাসা করলুম ব'লে মনেও কোরো না যে, আমি ভুলে গেছি। শুধু তোমার স্মরণশক্তি পরীক্ষা করছিলুম। নইলে আমার সাল, তারিখ, এমনকি ক্ষণসুদ্ধ মুখস্থ।

জেনে রাখো, আজ থেকে ঠিক উনিশ বছর আগে। কৃষ্ণকান্তের উইলের উপসংহারে ছায়া-রোহিণী বলেছিল, 'এইখানে, এমনি সময়ে···।' আমিও তাই ব'লে থামতে পারি। গোবিন্দলালের মতো তুমি যদি জিজ্ঞাসা করো, 'কী?' আমি বলব, 'আমি ডুবিয়াছিলাম।'

এই ডোবাটা বড়ো মনোরম।

তোমাকে আমি প্রথম দেখেই ভালোবেসেছিলাম। দেখ, সেদিনের কথা লিখতে গিয়ে কুড়ি বছর আগেকার মনটিকে ফিরে পেয়েছি ব'লেই কথাটা এত সহজে, অকপটে বলা গেল। এখন এসব কথা এভাবে লেখাই চলে না, অনেক আয়োজন ক'রে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে হয়।

ক্ষীণ একটু সম্পর্কের সুতো ধ'রে মুখচোরা যে-ছেলেটি সেদিন তোমাদের বাসায় যাওয়া-আসা করত, তাকে তোমার ততটা ভালো লাগেনি। মফস্বলের ছেলে, হসটেলে থেকে বি. এ. পড়ে। ভব্যতা জানে না, চলনে-বলনে বিলক্ষণ আড়ষ্ট। প্রথম দিনেই কতক্ষণ ধ'রে তোমাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল, মনে আছে? তুমি বিরক্ত হয়েছিলে। উষ্মা আর অস্বস্তি দুটোই ঢাকতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। ছেলেটির সব খবর যদি জানতে, তবে তোমার দয়া হ'ত। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালো, এ ছাড়া তার অন্য কোনো কৃতিত্ব ছিল না। অল্প বয়স থেকেই সে একা, সমবয়সীদের চেয়ে আলাদা। খেলাধুলায় রুচি নেই, সাঁতারে অপটু,

গাছে চড়তে উৎসাহ পায় না। সাইকেল চালাতে জানে না, নৌকোর হাল ধরতেও না। মজা কিছু পায় বই পড়ায়, প'ড়ে-প'ড়ে রঙিন কত কী কল্পনা করে। কিছু ভালো লাগে না, ভাবে, বর্তমান তাকে কিছু তো দেয়নি, ভাবীকাল হয়তো দেবে। এরই মধ্যে কাউকে যদি সহৃদয় মনে হয়েছে, সেই হীনমন্য ছেলেটি তবে তার চোখে সহানুভূতি খুঁজেছে।

তোমার চোখে যেমন খুঁজেছিল। কালো দুটি চোখের তারার দিকে চেয়ে ক্লিষ্ট, কুণ্ঠিত মন ব'লে ওঠে, এই তো আমার কূল পেয়ে গেছি, এমন অসম্ভব ব্যাপার শেষ কৈশোর বা প্রথম যৌবনেই সম্ভব। সে যা দেখে তা দেখে না, যা দেখতে চায় তাই দেখে, কিংবা তার নিয়তি তাকে যা দেখায়, তাই।

নইলে সেদিনই সে দেখতে পেত, যে-চোখ দুটির চাহনি তার কাছে নিমেষে সৌরমণ্ডলীর কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে, সে-দুটি সত্যি তেমন অপরূপ নয়। চুলের গুচ্ছ হয়তো সর্বনাশী, কিন্তু তার ঠোঁটের হাসিটি যেন বেশি প্রগল্ভ। সবচেয়ে বড়ো কথা, যে-অতলতা সে খুঁজেছিল, মেয়েটির মধ্যে তার কিছুমাত্র নেই।

লৌকিক অর্থে আমরা যাকে রূপ বলি, তারও সামান্যই তোমার ছিল।

তবু সে ফিরে-ফিরে আসত। নানা ছুতো ক'রে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইত। কোঁচা দিয়ে পরা ধুতির উপরে শার্ট, টেরিটাও ঠিক কালের রুচিমতো নয়, তুমি মুখ টিপে-টিপে হাসতে। সে ভাবত, প্রশ্রয়।

কিন্তু আসলে খুবই ভীরু কিনা, তাই ওর চেয়ে বেশি সে হয়তো কোনোদিন অগ্রসর হ'তে পারত না, কিন্তু একদিনের সামান্য একটু

জর তার কাছে শাপে বর হ'য়ে এল যে। তাকে বেহিসাবী, দুঃসাহসী ক'রে দিল।

সেদিনের কথা লিখে রাখতে ভালো লাগছে।

শনিবারের বিকেল, দুপুর থেকেই ঝমঝম বৃষ্টি, শরীরও আগে থেকেই খারাপ, তবু যে কেন দুর্যোগ মাথায় নিয়েও সেদিন ছেলেটি তোমাদের বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিল, তা কি সে নিজেই জানে? তোমাকে দু'খানা বই অবশ্য দেবার কথা ছিল, কিন্তু সেটা এমন কিছু জরুরি কাজ নয়। একদিন পরে দিলেও কিছু এসে যেত না।

দরজায় দাঁড়িয়ে ভয়ে-ভয়ে সে কড়া নেড়েছিল। ছেলেটির আধময়লা টুইলের শার্ট তখন ভিজে বুক-পিঠের সঙ্গে লেপ্‌টে গেছে। দরজা খুলে দিয়ে তুমি ব'লে উঠেছিলে, 'এ কী।' বোকা, কিন্তু বেপরোয়া ছেলেটি বলেছিল, 'বই দিতে এলাম।' তুমি একটু হাসলে। সেদিন তোমার পিঠের উপরে ঢালা চুল, চোখে কাজলের কৃত্রিমতা কিছুমাত্র নেই, আটপৌরে শাড়িটাও ঘরোয়া ধরনে পরা, অপলক অবাক ছেলেটি সব-কিছু ভুলে চেয়েই রইল। এ-আচরণটাও অসংগত, একটু বা অদ্ভুত, তবু সেদিন কিন্তু তুমি রাগ করোনি। খানিকটা খুশি আর খানিকটা লজ্জা মেশানো হাসি তোমার মুখে লেগেই ছিল। কখন তুমি তাকে শুকনো একটা তোয়ালে আর জামা দিয়ে গেছ, সে খেয়ালও করেনি।

তার চোখ দুটি অল্প-অল্প লাল, তোমার মা-র সেটা চোখ এড়ায়নি। বলেছিলেন, 'শরীর খারাপ নাকি।'

'ও কিছু নয়, মাসিমা।'

দেখতে-দেখতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। শরণার্থী হাওয়া জানলার পাল্লায় সমানে করাঘাত ক'রে চলেছে।

সেদিন হস্টেলে ছেলেটির ফেরা হয়নি। তোমার মা-ই ফিরতে দেননি। কেননা, একটু পরেই জোলো হাওয়ায় তার শরীর শীত-শীত ক'রে উঠেছিল, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। বাইরের ঘরের আলো নিবিয়ে হেলানো চেয়ারটায় সে চোখ বুঁজে প'ড়ে ছিল।

তারও অনেক পরে তুমি এলে। ছেলেটি টের পেয়েছিল। হয়তো পর্দা স'রে গিয়ে তার বন্ধ চোখের পাতায় আলো প'ড়ে থাকবে, হয়তো তোমার হাতের চুড়ি বেজেছিল। কিংবা হয়তো কিছুই হয়নি, এমনিতেই এসব টের পাওয়া যায়। একটি চিন্তাকে পাশে পাহারায় বসিয়ে রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তো, সে-ই হয়তো ইশারায় জানিয়ে দিয়ে থাকবে।

'খাবার দেওয়া হয়েছে।'

ছেলেটি তবু সাড়া দেয়নি, দিতে পারেনি। আরেকটু কাছে এসেছ তুমি, আবার বলেছ, 'খাবার দেওয়া হয়েছে', তখনও সাড়া না পেয়ে আরও কাছে এসে তার কপালে হাত রেখেছ। আ, সব জ্বালা যেন এক নিমেষে, ঈষৎ মাত্র স্পর্শে জুড়িয়ে গেল।

ছেলেটি তোমার মৃদু গলা শুনতে পেয়েছে, 'ইস, গা যে পুড়ে যাচ্ছে। এত জ্বর ?'

জ্বর যে কত, তার এতটুকু আভাসও কি তুমি সেদিন পেয়েছিলে। শুধু কপাল ছুঁয়ে তা জানা যায় না ; ছেলেটির বুকে হাত দিলে হয়তো টের পেতে।

সেই ছোঁয়াটুকু আমি আজও বাঁচিয়ে রেখেছি। সেই হিমকে, সেই জ্বালাকে ; সেই যন্ত্রণাকে, সেই শান্তিকে। চোখ বুঁজে সেদিন বারবার প্রার্থনা করেছি জ্বরটুকু যেন কোনোদিন আমার না সারে।

একটু পরে আলো জ্বলল, তোমার মা এলেন, দুধ এল, বার্লি এল।

তারও পর আলো নিবিয়ে বিছানায় যখন ফের শুয়ে পড়লুম, তখন সেই পরিবেশ-মোহ আবার ফিরে এল।

মনে হ'ল, জ্বর নয় যেন তুমি। কোনো-কোনো জ্বরকে মনে হয় মেয়ে, কখনও শুনেছ? সাধ হয়, সে আমাকে ছুঁয়ে থাকুক, জড়িয়ে ধরুক, মিশে যাক আমার মধ্যে। একটু পিপাসা, একটু জ্বালা, একটু বিকার হ'য়ে সে থাকুক, সারা রাত, আর ভোর হ'তে না হ'তে বিছানা থেকে যেন তাড়াতাড়ি উঠে না পালায়।

পালিয়েছিল কিন্তু। পরদিন সকালে সামান্য একটু অবসাদ ছাড়া সেই জ্বরের লেশমাত্র ছিল না। রিক্‌শা ডাকা হ'ল। পথ্য মুখে দিয়ে হস্টেলে ফিরে এলুম।

সেই ছোঁয়াটুকু তখনও কপালে স্নিগ্ধ জলপটির মতো লেগে আছে।

না, মাত্র সেই ছোঁয়াটুকুই না। রিক্‌শায় উঠে একবার ফিরে চেয়েছিলুম। দেখি, জানলার শিকে মুখ রেখে তুমি আমার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছ। সেই চোখে আর-কিছু পড়তে পাইনি, প্রীতি না সহানুভূতি, কিছু বুঝতে পারিনি। তবু ওই চাহনিটুকু সম্বল ক'রে আমি চ'লে এসেছি।

লিখতে-লিখতে কত বড়ো হ'য়ে পড়ছে দেখ, অথচ অন্তত এ-গল্পটাকে তো সাত কাহন ক'রে বলতে চাইনি। আসলে এটাকে গল্পই করতে চাইনি, একান্তই আমার নিজের জন্যে কয়েকটি রেখাচিত্র আঁকতে চেয়েছিলুম। একটু ছোঁয়া, একটিবার চাওয়া, আর কয়েক ফোঁটা চোখের জল— মাত্র এইটুকু কি কোনো গল্পের মালমসলা হয়। বানানো কোনো ঘটনা এ-কাহিনীতে তো জুড়তে পারব না? কী পরিতাপ বলো তো,

জীবনের প্রথম এবং একমাত্র ভালোবাসার স্মৃতি শুধু কয়েকটা ছবি হ'য়ে আছে।

যেমন মনে পড়ছে, একদিন তুমি আমার মাথার চুল এলোমেলো ক'রে দিয়েছিলে, বাহারের ছাঁট লাগিয়ে পরিপাটি ক'রে টেরি কেটে তোমাদের ওখানে গিয়েছিলুম। তুমি করলে কী, এদিক-ওদিক চেয়ে হঠাৎ এসে চুলগুলো অগোছালো ক'রে দিলে।

রুদ্ধপ্রায় গলায় বললুম, 'এ কী।'

'ছিঃ, ভালো দেখায় না।'

সেদিন মাথার দৃশ্য দিকটাই শুধু এলোমেলো হ'য়ে যায়নি।

অথচ তুমি আমাকে ভালোবাসতে না। মূঢ়তায় আমাকে পেয়ে বসেছিল, নইলে সেটা জানতেও আমার এতদিন লাগবে কেন। আর যখন জেনেছি, তখনও কি মানতে পেরেছি?

ভেবেছিলাম, সব কথাই আজ লিখব। একটু-একটু ক'রে কাছে টানার কাহিনী, একটু-একটু ক'রে স'রে যাওয়ার। ছোটো-ছোটো কত ঘটনা, যেন একেকটি ঢেউ, কাছে আসে, আছড়ে পড়ে, তবু ধরা দেয় না, ছুঁতে না ছুঁতে ফিরে যায়।

কিন্তু লিখে কী লাভ। তার যতটুকু দাম তা তো আমারই কাছে, কয়েকটি বিদ্যুৎ-পলক আমার মনে চিরকালের মেঘ হ'য়ে আছে।

তার চেয়ে শেষের দিকের কথা লিখে এই পর্বটা শেষ ক'রে দিই।

বোধ হয় দিনটা রবিবার ছিল। সকালেই তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম।

মাসিমার মুখেই কথাটা শুনতে পেলাম। পাত্র ভালো চাকরে, সদাগরি অফিসের অনামিকা আঙুলের মাপের কেরানী। ফটো দেখেই তোমাকে পছন্দ করেছে।

বললুম, 'এ তো সুখবর মাসিমা। মিষ্টি খাওয়ান।'

মাসিমা বললেন, 'রোসো বাবা। দু-হাত এক হোক আগে।'

একটা ফাঁকির হাসিকে মুখে ওড়নার মতো জড়িয়ে বাড়ির ভিতরে গেলুম। তুমি তখন সবে স্নান সেরে এসেছ। খোলা চুলের ভিজে মায়ায় চিরুনিটা বন্দী ক'রে রেখেছ!

হাসতে-হাসতেই বলেছি, 'খুব ফুর্তি দেখছি যে।'

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়েছ, আবার চেয়েই ফিরিয়ে নিয়েছ। মুখের একটি রেখাও নড়েনি।

'এত খুশি কেন।'

'কেন, জানো না?'

'জানি। মাসিমা এইমাত্র বলছিলেন।'

দাঁতে ঠোঁট টিপে বলেছ, 'যদি বলি সেইজন্যেই?'

বয়স কম ছিল, তখনও ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখিনি। তেমনি হেসে বলেছি, 'তোমার হিসাবে ভুল হয়নি। সাচ্ছল্য সুখ এইসবই চেয়েছ তো, সবই পাবে।'

কঠিন, চাপা গলায় বলেছ, 'অপদার্থ।' বলেছ, 'কাপুরুষ।' তারপর —সেই চুলের মায়াবদ্ধ চিরুনিটা তুলে আমার মুখে ছুঁড়ে মেরেছ।

চিরুনিটা দাঁতালো ছিল। আমার কপালে, চোখের ঠিক উপরে, কয়েকটা আঁচড় পড়েছে। হয়তো দু-এক ফোঁটা রক্তও জ'মে গিয়ে থাকবে। রুমালে মুখ চেপে চ'লে এসেছি।

সে-দাগ অনেক, অনেক দিন ধ'রে মেলায়নি। আমিই মিলিয়ে যেতে দিইনি।

সেদিন সারা দুপুর রোদে টোটো ক'রে ঘুরেছি। পানের সঙ্গে জর্দা খেয়েছি, পিক ফেলিনি; সিগারেট কিনে রাস্তার দড়িতে ধরাতে গিয়েও

ধরাইনি। আয়নার আমি-কে চোখে-চোখে জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি কি কাপুরুষ? সত্যি?

বোধ হয় ঠিকই বলেছিলে। সাহস থাকলে হয়তো তোমার বিয়েয় যেতুম। কোমরে গামছা বেঁধে, জামার হাতা গুটিয়ে অভ্যাগতদের লুচি-সন্দেশ যাচাই ক'রে ফিরতুম।

অতটা পারিনি। কলকাতায় শরীর টিঁকছে না এই ছুতোয় ট্রান্সফার নিয়ে মফস্বলের একটা কলেজে চ'লে এসেছি।

তারপর কতদিন হ'য়ে গেল, তোমাকে চোখেও দেখিনি। আবার হারাইওনি। যখনই চোখ বুঁজেছি, তোমাকে পেয়েছি। সেই স্বরকে, তোমার ছোঁয়াটুকুকে। তর্জনী দিয়ে কপালের কাটা দাগটা ছুঁয়েছি।

আমার মন ওষধির মতো। তাতে ভালোবাসা একবারই ফলেছিল। ফুলশয্যার রাত্রিও আমার জীবনে বারে-বারে এসেছে। তুমি ছিলে না, কিন্তু তোমার ভাবনা তো ছিল। একটি ভাবনাও বিনিদ্র রাত্রিতে রক্ত-মাংসের শয়নসঙ্গিনীর মতোই হ'তে পারে, হয়েছে।

তারপর এই এতদিন পরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল।

দৃশ্যটা কিছু কৌতুকের। একে শেষরাত্রি, তাতে রাজা-কি-মণ্ডী স্টেশনে আলোর ব্যবস্থা ভালো নয়। বাঙালী ব'লে সন্দেহ না হ'লে লক্ষ্যই করতুম না সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে, শীতে জড়সড় যিনি এক হাতে গাঁটরি এবং অন্য হাতে দুটি শিশুকে সামলাতে গিয়ে ঘেমে উঠছিলেন। তারপর কুলিকে কথা বোঝানো, সেও কি কম হাঙ্গামা। বাংলায় বললে সে তবু হয়তো কিছু বুঝত, কিন্তু ভদ্রলোক কেবলই 'হায়-হায়' ক'রে যেন তাঁর আক্ষেপটাই প্রকট করছিলেন। তাঁকে ঠেলে সরিয়ে যে-মহিলা অতঃপর এগিয়ে গেলেন, তিনি যে তুমি তা কী ক'রে

জানব। প্রথমে আমার সাইকেল-রিক্‌শা এবং একটু পরে তোমাদের টাঙ্গা একই হোটেলের সমুখে এসে না দাঁড়ালে জানা হ'তও না।

টাই-টুপি-পাতলুন পরলে হবে কি, আমার চেহারাতেও বোধ করি 'বাঙালী' কথাটা কোথাও বড়ো-বড়ো হরফে লেখা আছে। তোমার স্বামী বিচক্ষণ, এক লহমায় সেটা প'ড়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি বাঙালী ?'

বলতে হ'ল, 'হ্যাঁ। আপনাদের আমি স্টেশনেই দেখেছি। আমরা এক গাড়িতেই এলাম।'

তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলে। ফিরে তাকালে। বোধ হয় গলার স্বরে আমাকে চিনতে পেরে থাকবে। আমি তোমাকে চিনলুম কী ক'রে ? মুখ-চোখের প্রায় সব কয়টি পুরনো চিহ্নই তো লুপ্তপ্রায়। তবু চেনা যায়।

তুমি বলেছ, 'ভালোই হ'ল। বিদেশে একজন চেনা লোক পাওয়া গেল।'

তোমার স্বামী এক গাল হেসে বললেন, 'যা বলেছ। এ-ব্যাটাদের বিশ্বেস নেই। স্থবিধে পেলেই এরা গলায় ছুরি দেবে। আমি তো রাস্তায় বেরিয়ে ভয়ে-ভয়ে কাঁপি।'

তোমাদের সঙ্গেই ফতেপুর সিক্‌রি ঘুরলাম। বেলা দুপুর, কাঠফাটা রোদ্দুর। ছেলেমেয়ে দুটি খিদে পেয়েছে ব'লে বায়না ধরেছে, ফিরিওয়ালা দেখলেই এটা-ওটা কিনে খেতে চাইছে। আর তুমি তাদের কড়া গলায় ধমক দিচ্ছ। শেষে ওদের যখন আর থামানো গেল না, তখন ওখানেই উঁচু টিলাটার চত্বরে বসেছ। খুললে পোঁটলা, পাঁউরুটি বার করলে। খবরের কাগজে মোড়া ছিল খানিকটা চিনি, পিঁপড়ে তাড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে। শুকনো রুটি, দেখলুম দাঁতে কাটতেও ওদের কষ্ট হচ্ছে। খানিকটা ছিঁড়ে আমার দিকেও এগিয়ে দিয়েছ।

৭৫৪৯

বললুম, 'ওদের খিদে বোধ হয় যায়নি। ওরা আরও কিছু খাবে।'

তুমি বলেছ, 'আর বলবেন না, রাক্ষস একেকটি। বোধ হয় আমাকে খেলে ওদের খিদে মেটে।'

তোমার স্বামী বললেন, 'সকাল থেকে কিছু খায়নি তো। হোটেলে ফিরতে-ফিরতে সেই বিকেল।'

ধমক দিয়ে বলেছ, 'তুমি থামো। তোমার মতলবমতো চলতে গেলে খেয়ে-খেয়ে এতদিন ফতুর হ'য়ে যেতুম। শ্যামনগরের বাড়িটা আর হ'ত না।'

প্রয়োজন ছিল না, তবু প্রসঙ্গটার মোড় ফেরাতেই বলেছিলুম, 'বাড়িও করেছ নাকি।'

শুকনো রুটির টুকরো দাঁতে ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বলেছ, 'সব আমার বুদ্ধিতে। রিফিউজি লোন নিয়ে—'

'রিফিউজি ?'

'নই, তাই বলবেন তো ? নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'লে অমন একটু-আধটু এদিক-সেদিক করতে হয় মশাই।'

ওখানে ব'সেই শুনেছি, তোমরা তীর্থ করতে বেরিয়েছ। হরিদ্বার হ'য়ে গেছে। আজ রাত্রেই মথুরা-বৃন্দাবন যাবে। পথে আগ্রাটা ফাউ।

বেলা প'ড়ে এসেছিল। আগ্রা ফিরে লালকিল্লা দেখা হ'ল নামমাত্র। বললে, 'চলুন, তাড়াতাড়ি তাজটা সেরে আসি।'

'আমিও সঙ্গে যাব নাকি।'

'ক্ষতি কী।'

ক্ষতি নেই। কিন্তু লাভও কিছু আছে কিনা আমি তখন তাই ভাবছিলুম। সত্যি-সত্যি কী দেখলুম— তাজ ? কার সঙ্গে— তোমার ? সত্যিই তোমার সঙ্গে তো ?

হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিলুম, সেও একসঙ্গে। তোমাদের রসিদের নামটা দেখে কেমন খটকা লেগেছিল। যতদূর জানি, এ-নাম তো তোমার স্বামীর নয়। পদবীটাও যেন আলাদা।

চোখের ইশারায় আমাকে চুপ করালে। বাইরে এসে ফিসফিস ক'রে বললে, 'রেলের পাসে ঘুরছি তো। পাসটা ওঁর এক মামাতো ভাইয়ের। হোটেলের খাতায় আসল নাম লিখিয়ে শেষে যদি বিপদে পড়ি? আজকাল আবার যা সব কড়াকড়ি, বাবা।'

স্টেশনে পৌঁছে টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে ফের যখন খুচরো কয়েক আনার জন্যে কথা কাটাকাটি শুরু করেছিলে, তখন আর আমি সহ্য করতে পারিনি। একটা সিকি টাঙ্গাওয়ালার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে তোমার দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বলেছি, 'ছিঃ, এই একটু আগেই না তাজ দেখে এলে, আজ কি মোটে চার আনা নিয়ে দর কষাকষি করা সাজে?'

বোধ হয় সেই আমাদের শেষ কথা। কেননা, প্রায় তখুনি মথুরার গাড়ি হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল, তোমরা সেদিকে ছুটলে। আমি যাব টুণ্ডলার দিকে, গাড়ি আসতে তখনও বেশ কিছু দেরি।

তোমাদের গাড়ি ছেড়ে যাবার পর সেদিন ছাউনি স্টেশনের নিরালা একটি কোণে অনেকক্ষণ ব'সে থাকতে হয়েছে। কনকনে হাওয়া, দূরে-দূরে সিগনালের লাল নীল আলো, সেদিকে চেয়ে মনের মধ্যে অসীম শূন্যতা অনুভব করেছি। মনে করো এক ভিখিরি অন্ধকারে কী একটা কুড়িয়ে পেয়ে ভাবলে সেটা একটা মহামূল্য মণি, কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখলে। পরের দিন আলোয় গিঁট খুলে সে যদি দেখে, যত্ন ক'রে যা বেঁধেছিল তা একটা ঢেলা মাত্র, তবে তার মনে যে-হতাশা আসে তার পরিমাণ অনুমান করতে পারো? আমি কি তবে এতদিন কাচকে কাঞ্চন ব'লে ভুল করেছি?

কিন্তু কাচ কোনটা। ঠিক কিসে যে আঘাত পেয়েছি, সেটা প্রথমে ঠাহর করতে পারিনি। তোমার বয়স হয়েছে, কিন্তু সেজন্যও নয়। বয়স আমার নিজেরও কিছু কম হয়নি, বাঙালী হ'য়েও যে টুপি পরি, সে শুধু টাক ঢাকতে।

তবে কি তুমি বদলে গিয়েছ ব'লে? অনেকক্ষণ মনে করেছিলুম, বোধ হয় তাই। যে ছেলেমেয়েদের কম-কম খাইয়ে রাখে কলকাতার কাছে বাড়ি তুলতে, পরের পাসে নাম ভাঁড়িয়ে তীর্থ দেখে, সামান্য কিছু বাঁচাতে কোমরে আঁচল বেঁধে পথে দাঁড়িয়ে বচসা করে, এই এত বছর ধ'রে তাকেই কি মনে-মনে আমার সব-কিছু দিয়ে এলাম?

তুমি এত ছোটো, এত সামান্য? হ'য়ে গেছ, না, চিরকালই ছিলে?

পরে ভেবে দেখেছি, যা ছিলে তুমি, তাই আছ। আরও সব মেয়ের মতো ছোটো সুখের পাটিটিতে শুয়ে, ছোটো আশার বালিশটিকে বুকে জড়িয়ে রাখার চেয়ে বড়ো সাধ তোমার সেদিনও ছিল না। তুমি বদলাওনি।

আসলে, জানি না কবে, তোমাকে বদলে নিয়েছি আমি। মনে-মনে। তপ্ত শ্বাসের সঙ্গে চোখের জল মিলিয়ে যে-ছায়ামূর্তি তিলে-তিলে গড়েছি, কায়ার সঙ্গে তার কতটুকু মিল, ভেবেও দেখিনি। সেই অপরূপা কিন্তু আমারই একান্ত সৃষ্টি, আর, সেই হিসেবে আমার কন্যা। কী গর্হিত ব্যাপার দেখ, কন্যাকেই আমরা প্রিয়া ব'লে ভুল করেছি। আমরা সবাই বুঝি তাই করি।

পুনশ্চ : প্রথমে অবসাদ বোধ করেছিলুম। ভালোবাসা পাই না পাই, অন্তত ভালোবাসি, মনে-মনে এতদিন এই গর্বটুকু ছিল। সেটুকুও কেড়ে

নিয়ে তুমি আমাকে ঠকালে। পরে ভেবে দেখছি, তা-ও তো না। তুমি নেই ক্ষতি কী, আমি যাকে তৈরি ক'রে নিয়েছি সে আছে, তাকে ভালোবেসে যেতে তো কোনো বাধা নেই? প্রিয়া হোক, কন্যা হোক, আমার স্বর্ণসীতা আমরণ আমারই।

## শোক

ওরা সবাই হঠাৎ একসঙ্গে এভাবে নেমে গেল কেন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে। বুকের ভিতরটা কেমন করছে।

এ-ঘরে তাসের তুমুল আড্ডা বসেছিল; ও-ঘরে গানের আসর। হঠাৎ কে যেন এসে দাঁড়াল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কী বলল; চাপা গলা, শুনতে পাইনি। ফিসফিস ক'রে ওরা কী বলাবলি করল। তারপর নিঃশব্দে, ব্যস্তভাবে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

আর আমি, নতুন আচারের লোভে ভাঁড়ারে ঢুকে কাঁচের বয়মটা ছুঁয়ে কাঁপতে থাকলাম। কিছু বুঝলাম না, কিছু শুনলাম না, ওরা আমাকে কেন কিছু ব'লে গেল না, কেন একলা এত বড়ো বাসাটায় আমাকে ফেলে গেল। আমি যে ভাবব, আমি যে ভয় পাব।

এই বে-মেরামতী বাড়িটার জং-ধরা কবজাগুলো খিটখিটে, জানলা-কবাট সব ভীতু, হাওয়ার সাড়া পেলেই খুলে যায়, স'রে দাঁড়ায়, ঠকঠক ক'রে কাঁপে। এখন যদি হাওয়া হানা দেয় আমি কী করব। অসহায় পেয়ে সব ধুলো তো আমারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, দু-হাতে মুখ ঢেকে আত্মরক্ষা কি করতে পারব? হয়তো ম'রেই যাব। ঝড়ের ঝাপটে নয়, ভয়ে। ডাক্তার বলেছে, আমার কল্‌জে বড়ো ধুকপুকে, স্নায়ু ঝিমোনো। বলেছে কথায়-কথায় ভয় পেতে নেই।

তার চেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে যেতে চেষ্টা করি না কেন। হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লা দুটো ঠেসে দিই, ছিটকিনি হাতে যদি না পড়ে তবে জানলায় পিঠ ঠেকিয়ে তো দাঁড়াতে পারব!

তা-ও যদি না পারি, তবে অন্তত বসবার ঘরের ওই বুককেস্‌টার আড়ালে লুকোব। ওটা মজবুত আছে, সহজে নড়ে না। তারপর, খানিক দাপাদাপি ক'রে হামলাদার হাওয়া যখন পালিয়ে যাবে, তখন আবার হামাগুড়ি দিয়ে ওই অন্ধকার কোণ থেকেই বেরিয়ে আসব। হেলানো-চেয়ারটা তখনও হয়তো ধুলোয় ছেয়ে থাকবে, তা থাকুক।

চেয়ারে চিৎ হ'য়ে শুয়ে চোখ বুঁজব। হাঁপাব। জিভটাকে চোয়ালের ভিতরের দেয়ালে বুলিয়ে-বুলিয়ে কিংবা ঠোঁট চেটে-চেটেই পিপাসা মেটাব। পিপাসা যাবে, আমার ভয় যাবে। ভয় যখন যাবে, আমি তখন ভাবব।

আর কিছু তো পারি না, চলতে না, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে না, পড়তে না, খেতে না, বলতে না, কিন্তু ভাবতে এখনও পারি। সুখের কথা, দুঃখের কথা। পুরনো সুখের কথা ভেবে-ভেবে দুঃখ পাই, দুঃখের কথা ভেবে সুখ। সিতেশ-ঠাকুরপো বলতেন, একটা জায়গায় পৌঁছে দুটোই এক হ'য়ে যায়। আলাদা ক'রে চেনা যায় না। যেন যুগ্ম স্বরধ্বনি।

কতদিন ভেবেছি, দুঃখ পাবার ক্ষমতাটুকুও যেদিন থাকবে না, তার আগেই যেন আমার মরণ ঘটে। অথবা ঘটবার প্রয়োজনও বুঝি হবে না, কারণ ওই ক্ষমতাটুকু খোয়ানোরই আরেক নাম মৃত্যু।

মৃত্যু আসলে আলাদা কোনো ঘটনাই নয়। সলতে ফুরিয়ে আলো একসময়ে নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই কি নেবে? যে-মুহূর্তে জ্বলেছিল, সেই মুহূর্ত থেকেই তো নিবেও আসছিল। সলতেটা যখন জ্বলছিল, তখনই পুড়ছিল, একটু-একটু ক'রে নিবছিলও। আমরা যেমন এক-একটি মুহূর্তের মধ্যে একটু-একটু ক'রে বাঁচি, সেই সঙ্গে তেমনই একটু-একটু ক'রে মরিও। আস্তে-আস্তে ক'রে ফুরোনোর পালাও একদিন ফুরোয়। সেই শূন্যতাকেই আমরা বলি শব। সব-শেষকে, সব বিয়োগের যোগফলকে ঢেকে দিই শাদা চাদরে; সমারোহে সমাধি দিই।

মৃত্যুর কথা থাক। দুঃখের কথা বলছিলুম, তাই বলি।

অনেক দিন ভেবেছি, শিশু মাটিতে প'ড়েই কাঁদে কেন। তার দুঃখ কী। কেউ জানে না, বড়ো হ'য়ে সে-কথা কারুর মনে পড়ে না। বিজ্ঞানীরা নানারকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এটা তো ঠিক, সৃষ্টির আদিতে যেমন অন্ধকার, অনুভূতির আদিতে তেমন দুঃখ। বোধ হয় অন্তেও।

আজ আমার এই চেয়ারে শুয়ে-শুয়ে, যখন ঝড় থেমে গেছে, আমার মনের ভয় কেটেছে, তখন আদি, মধ্য, অন্ত্য সব পর্বের কথাই ভাবা যেত। কিন্তু এখন আমাকে ভাবতে হবে— ওরা গেল কোথায়।

.. .. ..

ওরা লুকোতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না তো।

জানতে আমার কিছু কি বাকি রইল।

বড়ো বউমা ফিরে এসেছিল সবার আগে। ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আস্তে কবাট ঠেলে ঘরে ঢুকতে যাবে, আমি একেবারে সামনে পথ জুড়ে দাঁড়ালুম।

'মা!' অস্বস্তিতে, ভয়ে ও যেন চেঁচিয়ে উঠল। —'আপনি এখনও ঘুমননি?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে বললুম, 'এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে বউমা?'

কিছুদিন থেকেই কথা জড়িয়ে যায়, নিজের গলা নিজেকেই যেন ভেংচি কাটে, তবু যথাসাধ্য স্পষ্ট ক'রেই উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলুম। —'কোথায় গিয়েছিলে বউমা। সুনীল, অনিল, এরাই বা সব কোথায় গেল।'

'সিতেশ-কাকার বাড়ি।'

'সেখানে ? হঠাৎ ? এত রাত্রে ?'

বউমা এবার আমার চোখের দিকে সোজাসুজি চাইল। চোখ নামিয়েও নিল সঙ্গে-সঙ্গে। বুঝলুম, ইতস্তত করছে। আস্তে-আস্তে বলল, 'কাকার অসুখ।'

'কী অসুখ বউমা ?'

'এমন কিছু নয়। মাথা ঘুরে প'ড়ে গেছলেন।'

বুঝলুম, মিছে কথা বলছে। মিছে কথার মুশকিলই ওই, কেমন যেন টের পাওয়া যায়। অন্তত আমি টের পাই। অনেক বয়স হ'ল তো, এখন আমি খুনখুনে বুড়ি। অনেক কথা সারা জীবন ধ'রে শুনেছি, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে চট ক'রে ধ'রে ফেলি। বলার ভঙ্গি, স্বরের তারতম্য থেকেই টের পাই।

আমার কথায় কোথা থেকে এত জোর এল জানি না, ব'লে উঠলুম, 'বউমা, আমিও যাব।'

ও অবাক হ'য়ে চাইল। আমার পা দুটি তখন ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। ও বলল, 'মা আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারেন না, আপনি যাবেন অতদূর ?'

জেদ ক'রে বললুম, 'যাবই।'

'বেশ, আপনার ছেলে আসুক, তাকে বলবেন।'

ওর গলা রূঢ় শোনাল। রাগ করেছে।

আমি সেই থেকে ঘুমইনি, অপেক্ষা করেছি, ওরা কখন ফেরে, অনিল আর সুনীল। মাঝে-মাঝে চোখ জড়িয়ে এল, তবু জেগে রইলুম। ওরা ফিরল একেবারে শেষ রাত্রে।

বউমাই দরজা খুলে দিয়ে থাকবে। আমি নিজেকে টেনে-টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেলুম। ওরা ফিসফিস ক'রে কথা বলছে।

'এখানেই একটু আগুন জ্বালো। এক টুকরো লোহাও ছুঁইয়ে দাও …কাপড়ও তো ভিজে…মাকে এখনই কিছু বোলো না, কষ্ট পাবেন।'

বউমাকে চাপা গলায় বলতে শুনলুম, 'মা কিন্তু আমার ফিরে আসা অবধি জেগে ছিলেন। বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন। ওখানে যেতেও চেয়েছিলেন।'

সবই তো জানতুম।

কিভাবে, কখন বিছানায় ফিরে এসেছি, জানি না। চোখের পাতা অল্প-অল্প ক'রে বুঁজছিল, কী আশ্চর্য, ঘুমিয়েও পড়লুম। কম বয়সে, শখ ক'রে মাঝে-মাঝে নাইতে নেমে জলের নিচে ডুব দিয়ে থাকতুম। যতক্ষণ পারা যায়। এই ঘুমও তেমনই। ভোরে ভাঙল না, রোদ উঠলেও না, ধড়মড় ক'রে যখন উঠে বসলুম, তখন বেলা অনেক হ'য়ে গিয়েছে।

বউমাকে বললুম, 'এতখানি বেলা হয়েছে আমাকে ডেকে দাওনি?'

'আপনি যে ঘুমচ্ছিলেন।'

'খোকা কোথায়? ডেকে দাও।'

অনিল এসে পায়ের কাছে বসল। ওর দুটি চোখই লাল। ও-ও কি কেঁদেছে? এ-বয়সের ছেলেরা কি কাঁদে। ওদের তো শুধু হাসাহাসি করতেই দেখি। বোধ হয় কাঁদেনি—লাল চোখ দুটিতে শ্মশানে রাত-জাগার চিহ্ন।

বললুম, 'খোকা লুকোসনে। আমি সব বুঝেছি। কী হয়েছিল বল তো। সিতেশ-ঠাকুরপো কী রোগে—'

'রোগ তেমন কিছু নয় তো। ক'দিন থেকেই বলছিলেন, দুর্বল লাগছে। আমাদের এখানেও আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।'

মৃদু গলায় বললুম, 'হ্যাঁ। ওঁকে অন্তত চার দিন দেখিনি।'

'হঠাৎ মাথা ঘুরে কলতলায় প'ড়ে গেলেন। ধরাধরি ক'রে ওরা

শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তার এল কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।'

'সব শেষ?' আমার স্বর আর্তনাদের মতো শোনা গেল হয়তো, খোকা এগিয়ে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

'রোগটা আসলে কিছু না। এ-বয়সে, মা, বয়সটাই রোগ। শরীর-মনের জোর তো থাকে না, সামান্য কিছু হ'লেই লোকে ভেঙে পড়ে। অসুখটা উপলক্ষ। তা ছাড়া সিতেশ-কাকার সময়ও হয়েছিল— একাত্তর বছরে পড়েছিলেন।'

একাত্তর? চমকে উঠলুম। আস্তে-আস্তে বললুম, 'এই আশ্বিনে আমারও সত্তর বছর পূর্ণ হবে খোকা।'

খোকা কিছু বলল না। পিঠে হাত বুলিয়েই দিতে থাকল।

হঠাৎ সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বললুম, 'খোকা, আমাকে একবার নিয়ে যাবি?'

'তুমি? তুমি কী ক'রে যাবে। গিয়েই বা কী হবে।'

'নইলে, নইলে আমি যে শান্তি পাব না।'

খোকা বলল, 'ছি, মা, ছি। অতটা ব্যাকুল হ'তে নেই।'

এতক্ষণ সব আবেগ চাপা ছিল, এবার হাহাকার ক'রে ব'লে উঠলুম, 'তোরা জানিস না। সিতেশ-ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার কত দিনের চেনা।'

মাথা নিচু ক'রে খোকা বলল, 'জানি মা, সব জানি।'

সব জানে? ও-কথা কেন বলল খোকা। কী জানে, কতটুকুই বা জানা ওদের সম্ভব। কিছু না। হয়তো মনগড়া কয়েকটা ধারণা নিয়ে ব'সে আছে। একটু আগেও বলেছে— ছি, মা, ছি। ছি বলতে গেল কেন। অন্যায় আমি কী করেছি।

অনেক কথাই মনে পড়ছে।

কবে থেকে চিনতুম সিতেশ-ঠাকুরপোকে। বছরের হিসেব তো নেই— সেই তেরো বছর বয়স থেকেই, যখন আমার বিয়ে হয়েছিল, যখন নাকে নোলক পরতুম। শুধু আমি না, আমার বয়সী সবাই পরত।

সেই সে-কালে মনটা একটু তরল, একটু বায়বীয় পদার্থ ছিল, অদ্ভুত সব-কিছুতে বিশ্বাস করত। তখন জানতুম, অনেক কালো বেড়াল এক-সঙ্গে কড়ায় তেলে চুবিয়ে জ্বাল দিয়ে বিধাতা অমাবস্যার অন্ধকার তৈরি করেন। পুতুলকে তখন প্রাণহীন মনে করতে শিখিনি, তা সে খেলার পুতুলই হোক, কি পুজোর পুতুল হোক।

বিয়ের পরে শিবপুজো আর করিনি। স্বামীকে পেলুম। শুনলুম, তিনিই আমার শিব। খেলার পুতুলেরা পরে কোলে এল।

আর এলেন সিতেশ-ঠাকুরপো। আমার স্বামীর বন্ধু— কিন্তু বয়সে ওঁর চেয়ে বেশ ছোটো। প্রায় আমার সমবয়সী। বলতে ভুলেছি, আমার স্বামী বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। বাংলার বাইরে ছোটো একটা শহরে চাকরি করতেন— বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর তাঁকে একরকম দেখিইনি।

কিন্তু সিতেশ-ঠাকুরপো আসতেন। স্কুল থেকে জলপানি পেয়ে পাস দিলেন, কলেজে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতুম, খেলতুম, শাশুড়ীর কাছে ধমক খেয়েও ছাত থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলা অবধি ছুটোছুটি ছাড়িনি। শাড়িটা যদি খ'সে যায়-যায় হয়েছে, লজ্জা পাইনি, আঁচলটা ক'ষে কোমরে বেঁধেছি। কখনও শাড়িটার পাড় পায়ে জড়িয়ে গেলে হোঁচট খেয়েছি।

শুধু খেলাই না। সিতেশ-ঠাকুরপোর পড়ার বইও লুকিয়ে পড়তে শুরু

ক'রে দিয়েছিলুম। ওর সঙ্গে কত যে ঝগড়া হ'ত, তর্ক হ'ত। বই পড়তুম, কিছু বুঝতুম, কিছুটা বুঝতুম না। মানে জেনে নিয়ে ফের পড়তুম। লুকিয়ে সংস্কৃতে আদ্য-মধ্য দুটো পরীক্ষা দিয়েছিলুম, সিতেশ-ঠাকুরপোর উৎসাহে। উপাধি পরীক্ষাটা দেওয়া আর হয়নি। শেষে একদিন ওর কলেজের ক্লাসের বইও পড়তে আরম্ভ ক'রে ওকে প্রায় ধ'রে ফেললুম।

এরই ফাঁকে-ফাঁকে স্বামী যখন আসতেন, অবাক হতেন। 'তুমি এত সব শিখলে কোথায় ?'

'সিতু-ঠাকুরপোর কাছে।' নিঃসংকোচে বলতুম।

স্বামী বললেন, 'ও।'

একটিমাত্র অক্ষর, তবু মনে হ'ত একটু যেন আহত স্বর, একটু বা গম্ভীর। তখন সংকোচ হ'ত।

কখনও-কখনও উনি দেখেছেন, মাথায় খোলা চুল, ঘোমটা নেই, সিতেশ-ঠাকুরপোর সঙ্গে সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে ব'সে গল্প করছি। উনি দেখতেন, থমকে দাঁড়াতেন, মনে হ'ত কী বুঝি বলবেন, বলতেন না, নিজের ঘরে ঢুকতেন।

একদিন দেখি, বাক্স গোছাচ্ছেন। ওঁকে সেদিন কাজের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। বললুম, 'আবার কবে আসবে।'

বললেন, 'আর আসব না।'

'কেন ?'

'তুমি খুশি হও না ব'লে।'

ব'লে উঠলুম, 'মিছে কথা। খুব খুশি হই।'

বিরস গলায় উনি বললেন, 'তার চিহ্ন তো দেখিনে।'

ছেলেমানুষ ছিলুম তো, রোখ চাপলে তখন চুপ ক'রে যেতে পারতুম না। 'কে এলে আমি খুশি হই, তোমার মনে হয় ?'

উনি শান্ত স্বরে বললেন, 'নামটা নেহাৎই কি আমার মুখে শুনতে হবে? সে কি তুমি নিজেও জানো না?'

চ'লে যাবার আগে উনি কাছে এগিয়ে এলেন, আমার চিবুক তুলে ধ'রে বললেন, 'তুমি জানো না, বুঝতে পারো না, আমি কত দুঃখ পাই।'

দুঃখ! এই কথাটার নতুন অর্থ তখন সবে জানতে শিখেছি। আগেও দুঃখ ছিল— গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে খাওয়া যেদিন বারণ হয়েছিল, সেদিন দুঃখ পেয়েছি, পা ছড়িয়ে ব'সে কেঁদেছি। এই সেদিনও তো দুঃখ হ'ত মনের মতো শাড়ি পরতে না পেলে। সে-ও দুঃখ— কিন্তু অর্থের পোশাক বদলে আজ ফিরে এসেছে। সকালের রোদ আর দুপুরের জ্বালা যেমন এক হ'য়েও আলাদা।

সেদিন উনি চ'লে যাবার পর অনেকক্ষণ কেঁদেছি। আগে কাঁদতুম পায়ে কাঁটা ফুটলে। এখনও কাঁটা ফুটলে কাঁদি, কিন্তু সে-কাঁটা পায়ে ফোটে না, শরীরের কোথাও না।

সুখেরও স্বাদ বদলে গিয়েছিল, যাচ্ছিল। নরম বালিশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াই সেরা সুখ, অল্প বয়সে তাই জানতুম। কিংবা বৃষ্টিতে উঠনে দৌড়োদৌড়ি ক'রে শিল কুড়নো। কিন্তু দীর্ঘ রাত জুড়ে বিছানায় জেগে থেকে ছটফট করা, অথবা কোনো একজনের কথা অহর্নিশি ভাবাও যে এক ধরনের সুখ, সেটা অনুভূতির পর্দায় সরে একটু-একটু দোলা দিতে শুরু করেছে। সেই সুখ প্রিয়জন কেউ এলে থেকে-থেকে বুকে কাঁপে। তার আসন আধেক-বুঁজে-আসা চোখের পাতায়।

আমার স্বামী কিন্তু তাঁর প্রথম যৌবনের দুঃখের সঙ্গে সহজেই সন্ধি ক'রে নিতে পেরেছিলেন। কিছুদিন পরে কলকাতাতেই একটা কাজ

নিয়ে ফিরে এলেন। কোলে খোকা এল। সিতেশ-ঠাকুরপো একটা কলেজে প্রফেসর হয়েছিলেন, বিয়ে করেননি, রোজ বিকেলে আসতেন। কিন্তু ওঁকে কোনোদিন আর অনুযোগ করতে শুনিনি।

কেননা, আমাদের সম্পর্কটা তিনি তখন ধরতে পেরেছিলেন। দুটি সমবয়সীর সখ্য ; রুচির মিল। হয়তো তারই উপরে আবেগের হালকা রঙের প্রলেপ। তার বেশি কিছু না।

উনি বুঝতেন। আমরা যখন গল্প করছি, এসে বসতেন। ইচ্ছে হ'লে আমাদের কথায় যোগ দিতেন। আবার উঠেও যেতেন।

কিন্তু ছেলেরা বোঝেনি। অনিল না, সুনীলও না। আজ যে-গলায় অনিল বলেছে 'ছি, মা, ছি', সেই তিরস্কারের ভঙ্গিটি কত দিন ওদের চোখে ফুটে উঠতে দেখেছি। ওরা যখন কিশোর তখন থেকেই।

হয়তো পাড়ার লোক কিছু বলত। বন্ধুরা ঠাট্টা করত। অনিল এক-একদিন হিংস্র গলায় বলেছে, 'সিতেশ-কাকা রোজ-রোজ কেন আসে মা, কেন আসে ?'

'বা-রে, কাকা হন যে তোমার, আসবেন না ?'

'কাকা না আরও কিছু। আমি সব বুঝি, সব জানি।'

মনে পাপ নেই, তবু আমার মুখ শাদা হ'য়ে গিয়েছিল। উনি আড়ালে কোথায় ছিলেন, এগিয়ে এসে ঠাস-ঠাস ক'রে ছেলেকে কয়েকটা চড় মেরেছিলেন। আমি তো মা, ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছি, অনিল আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খেল, তবু আমার কাছে এল না, ওকে ছুঁতে দিল না।

সবই আজ মনে পড়ছে।

সিতেশ-ঠাকুরপো ঘরের একজনের মতোই হ'য়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁকে ওরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

ওঁর মৃত্যুর পর সিতেশ-ঠাকুরপো একদিন বলেছিলেন, 'আমি আর আসব না।'

'কেন ?'

'ছেলেরা হয়তো পছন্দ করছে না।'

দৃঢ় স্বরে বলেছি, 'বাড়ি ছেলেদের একার নয়। তোমাকে আসতেই হবে ঠাকুরপো।'

উনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। পরে ধীর গলায় বললেন, 'আচ্ছা।'

রোজই আসতেন। নতুন-নতুন বই আনতেন। থান কাপড় প'রে, পুজো সেরে ওঁর কাছে গিয়ে বসতুম। তখন আলোচনার বিষয়ও বদলে গিয়েছে। আগে বেশির ভাগ কথাই হ'ত শিল্পকলা বা কাব্য নিয়ে, এখন জানি না কী ক'রে বা কোথা থেকে ধর্মের প্রসঙ্গও এসে পড়তে লাগল। যা নিয়ে কখনও ভাবিনি, সেই মরজীবনের পর-জীবন নিয়েও কত দিন কত কথা হ'ত। আত্মার কথা আলোচনা করেছি আমরা, ভক্তির কথা, মুক্তির কথা।

বয়স অলক্ষ্য মাস্টারও। আমাদের রুচিও বদলে দেয়। আমরা বেড়াতেও যেতুম দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে। মন্দিরে গিয়ে কথকতা শুনতুম।

ছেলেরা হাসত। বউমা বিচিত্র দৃষ্টিতে চাইত।

ওরা তো হাসবেই। ঠাট্টা করবেই। ওরা তরুণ যে। যৌবনটা অহংকারের কাল। দেহবলে বলীয়ান। সেই বলটা মদের মতো। চেতনা, বুদ্ধি, সব আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। পৃথিবী যেন একা তারই, আর কারও না। শিশুর না, প্রৌঢ়ের না, জরাগ্রস্তের না। আপনবয়সী ছাড়া আর সকলকেই কৃপা বা করুণা করে। কী ধৃষ্টতা, এখন তো বুঝেছি। গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে যৌবন যাদের আসেনি বা গিয়েছে, তারাই

তো সংখ্যায় বেশি। শ্রেষ্ঠ, স্থায়ী শিল্প-কীর্তির কতটুকু যৌবনের সৃষ্টি? জ্ঞানান্বেষণের কতটুকুতে বা যৌবনের দাবি। প্রৌঢ় আর প্রাজ্ঞরাই চিন্তার ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। শুধুমাত্র জৈব-সৃষ্টির ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও তো যৌবনের অনন্য নৈপুণ্য দেখিনে।

এসব কথা সিতেশ-ঠাকুরপো আমাকে বলতেন, বোঝাতেন। ওরা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনত, হাসত। এমন দিন আসবে, আসছে, যখন ওরা বলবে, ওদের ছেলেরা হাসবে।

বয়স বেড়েছে, সিতেশ-ঠাকুরপো লাঠি ধরেছেন, আমি চশমা। ঝুঁকে প'ড়ে বই পড়ি, আর ভাবি। ভাবনার জালে অজানা কত কী এসে রোজ ধরা দেয়।

তার কোনোটা পাখি, কোনোটা প্রজাপতি। তাদের সন্তর্পণে তুলে ধরি, পরখ করি। তারা আমার জানার সীমানাটা একটু-একটু ক'রে বাড়িয়ে দেয়।

খানিক আগে সুখ-দুঃখের কথা বলেছি। টের পাচ্ছিলুম, আমার সুখ-দুঃখের স্বাদ আবার ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে; ফিরে যাচ্ছে আবার সেই শৈশবে বা কৈশোরে, যখন আচার খেতে ভালো লাগত। এখন এই বয়সে আবার লুকিয়ে টক কুল খেতে শিখেছি। সেই আমার সুখ। এ-সুখ বুকে কাঁপে না, জিভ দিয়ে লালা হ'য়ে ঝরে। সেই কৈশোরে যেমন ঝরত। পুরনোই নতুন হ'য়ে ফিরে এসেছে। একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ ক'রে আদি বিন্দুতে এসে ঠেকেছি।

কিংবা ঠেকিনি, ঠেকব। আমার মৃত্যুর মুহূর্তে জন্মক্ষণটিকে ফিরে পাব।

পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে ষাটে পড়ল, ষাট গড়িয়ে-গড়িয়ে ঢ'লে পড়েছে সত্তরে। সিতেশ-ঠাকুরপো প্রতিদিনই এসেছেন। আগে লাঠি ভর

ক'রে, শেষের দিকে লাঠিতেও হ'ত না, একটি রিক্‌শার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। তবু রোজ আসা চাই।

এসে বসতেন বাইরের ঘরে। লাঠিটা এক কোণে রেখে ঘাম মুছতেন। আমিও এসে বসতুম। তখন আর কথা হ'ত না, বেশি না। উনি একটু হাসতেন, আমিও। দুটি হাসি মাঝপথে মিলে কয়েক মুহূর্ত স্থির হ'য়ে থাকত। এমন কত দিন হয়েছে। এক ঘণ্টার উপরে আমরা একই ঘরে ব'সে থেকেছি, কিন্তু একটিও কথা হয়নি, আমাদের শুধু দেখা হয়েছে।

সেই দিনান্তের দেখাটুকুও একদিন শেষ হ'ল। ওঁর হার্টের অসুখ হ'ল, উপরে উঠতে পারেন না। আমি বাতে বিছানা নিয়েছি, নিচে নামি না।

তখনও আসতেন। দোতলায় শুয়ে-শুয়ে ঠিক সময়ে বাইরের রকে লাঠির ঠুক্‌ঠুক কখন শোনা যাবে, তার অপেক্ষা করতুম। সেই ঠুক্‌ঠুক আর কিছু না, শুধু জানানো, উনি আছেন, এখনও আছেন। শুধু জেনে নিতে আসা, আমি আছি কি না।

দেহে তো সাড়া নেই, সমস্ত মন ব্যাকুল হ'য়ে ব'লে উঠত, আছি, আমিও আছি। সেই সাড়া কোনো ধ্বনিকে ভর ক'রে ওঁর কাছে যেত না, কিন্তু পৌঁছত ঠিক। উনি বুঝতেন। রকে ব'সেই খানিক জিরিয়ে লাঠি ঠুক্‌ঠুক ক'রে ফিরে যেতেন।

সেই আসা-যাওয়াটুকুও শেষ হ'য়ে গেল।

আমি ভয় পেয়েছি, আকুল হয়েছি। আমি কাঁদছি।

সময় পূর্ণ হ'লে যারা যায়, সংসার থেকে অপ্রয়োজনীয় ব'লে খারিজের খাতায় যাদের নাম ওঠে, তাদের মৃত্যুতে কি কেউ কাঁদে?

কাঁদে। বুড়োর জন্যে বুড়িরাই কাঁদে।

সে-কান্না শুধু বিচ্ছেদের শোকে নয়। সেই বয়সে প্রতিটি সমবয়সীর

মরণ তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদেরও যাবার দিন এল ব'লে। পরের পালা তারও হ'তে পারে।

আমিও যাব। তাই কাঁদছি। আমি মরলে কেউ তো কাঁদবে না, অন্তত সত্যিকারের কান্না না, তাই নিজের মরণের কান্না নিজেই কেঁদে রাখছি।

আমার ছেলে, ছেলের বউ ভুল বুঝেছে। ভাবছে আমি কাঁদছি সিতেশ-ঠাকুরপোর শোকে। তা তো নয়, আমি কাঁদছি আমার নিজেরই মৃত্যু-শোকে।

. . . . . . . . . . . . . . . .

## চি র রূ পা

প্রমীলার মালা দিয়ে সাজানো ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে যমুনা বলেছিল, 'আমিও ছবি হ'য়ে যাব।'

একটু আগে এই কথাটাই শাদা একটা কাগজে লিখেছে। লেখাটা পছন্দ হয়নি, ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে উড়িয়ে দিয়েছে।

কেননা, ঘাড় ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মানে হয় না।

স্পষ্টকথা সোজাসুজি লেখাই ভালো। বিষয়ী যেভাবে উইল লেখে : সাত উকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি ক'রেও যার দুটো মানে পায় না। ডাক্তার লেখে প্রেসক্রিপশন— দাগে-দাগে মাপা হিসেব। বাজারের ফর্দেরও একটাই মানে হয়।

অর্থাৎ এসব লেখা তেমনই হওয়া ভালো, যার অর্থের কোনো বাড়তি ছায়া পড়ে না। একটুও ধোঁয়া নেই। যতটুকু লেখা হয়েছে ঠিক ততটুকুই।

তা তো নয়, যমুনা লিখেছিল কিনা, 'আমি ছবি হ'য়ে যাব।' মাৎ হ'তে ব'সেও রহস্যের একটা সস্তা কিস্তি দিতে চেয়েছিল। সেটা যেই টের পেয়েছে, কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

তবু ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে আবার সেই কথাই তো বলল। বলল, সে-ও ছবি হবে। তার আগেই অবশ্য সে ভেবে নিয়েছে, মানুষ কী-কী হ'তে চায়, হ'তে পারে। পাখি, ফুল, তারা— এইসব হয়তো হ'তে চায়, যমুনা ঠিক জানে না। সে তো চায় না। হওয়া যায় না ব'লে। সহজে যা হওয়া যায়, তা হ'ল, ছাই কিংবা মাটি। অথবা পাথর। প্রাতঃস্মরণীয়েরা যা হন। চৌরাস্তার মোড়ে, পার্কের ধারে।

পাস-করা হোক বা যা-ই হোক, আসলে তো সামান্য মেয়েমানুষই, বিশেষ ক'রে যার মন ভেঙে গেছে, সে আর কী হবে, যমুনা শুধু ছবি হ'তে চায়। দেয়ালের ছবি, এনলার্জ-করা, ফুলের মালায় ঘেরা। যাক, ফুলেই বা কাজ কী, ফুল তো শুকোয়। নিত্য নতুন তাজা রং যোগাবে কে। কার দায়।

তার চেয়ে শুধু ছবিই ভালো। শাদাসিধে ফ্রেমে বাঁধানো একখানি মুখ, খানিকটা আলো, খানিক ছায়া; কপোলে চিবুকে আলো, ছায়া চুলে আর চোখে। আর ঠোঁটের কোণের এই হাসিটুকু ফুলের মতো দু-দিনেই তো বাসী হবে না।

বিয়ের পর প্রথম তিন বছর ওই ফটোটার কিন্তু অস্তিত্ব ছিল না। ওটা আবিষ্কৃত হ'ল শ্রীধর মিত্তির লেনের ছোটো বাসাটা যখন ছেড়ে এল, সেই সময়ে।

সেখানে মোটে একখানাই ঘর। বিছানা পড়লে ভ'রে যেত। পা রাখবার জায়গা থাকত না। পাপোশে পা মুছে, আঁচলে হাত ঘ'ষে যমুনা টুপ ক'রে আলো নিবিয়ে পা টিপে-টিপে বিছানায় উঠত। তারপর অন্ধকারে সমীরের নাকের কাছে সন্তর্পণে হাত নিয়ে পরখ করত, নিশ্বাস জোরে পড়ছে কি ধীরে। মানুষটা ঘুমিয়েছে কিনা। সেই হাতের আঙুলটাই ধ'রে ফেলত সমীর। ছোঁয়াত ঠোঁটে, রাখত বুকে। তারপর শুধু হাতটা না, মুখ-বুক সব টেনে নিয়ে নিজের সঙ্গেই যমুনাকে মিশিয়ে দিত।

'এক আর এক কত হয়?'

পুরনো প্রশ্ন, উত্তরটা জানা। তবু যমুনা রোজই বলত, 'দুই।'

'কক্ষনো না। এই দেখ, এক আর এক যোগ দিয়েও আমরা একই র'য়ে গেছি।'

আরও একটা খেলা ছিল সমীরের। একে আর একে একাকার হ'য়ে যাবার পরও, ঘুমিয়ে পড়বার ঠিক আগে জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করত, 'ভালোবাসো ?'

'বাসি।'

'ভালোবাসো।'

'বাসি।'

'ভালোবাসো।'

যমুনাকে আবার বলতে হ'ত, 'বাসি।'

তিন সত্যি করিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে সমীর ঘুমিয়ে পড়ত।

একটি মোটে দরজা ছিল পুব দিকে : দরজার উপরে সবুজ রঙের কাচ-বসানো স্কাই-লাইট ছিল। সকালের রোদটুকু সবুজ হ'য়ে ঘরে ছড়িয়ে পড়ত। মনে হ'ত যেন জ্যোৎস্না।

ভোরে স্নান সেরে আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে যমুনা ঘন চুলের ভিতর দিয়ে চিরুনি টানত ; তখন শুয়ে-শুয়েই সমীর ওকে ইশারায় কাছে ডাকত।

দাঁতে চুলের ফিতে চেপে ধ'রে ঘাড় ফিরিয়ে যমুনা বলত, 'কী।'

সমীর শুধু হাতটা বাড়িয়ে দিত।

'সিগারেট খাবে বুঝি ? প্যাকেটটা দেব ?'

সিগারেট না। যা খেলেও ফুরোয় না, সমীরের তাই চাই।

যমুনা বলত, 'অসভ্য'; বলত, 'ছিঃ, এটা দিনের বেলা না ?'

'কেন, তুমি কি দিনকা বাঘিনী ?'

'কেউ যদি দেখে ?'

'কেউ নেই। কেউ আসবে না। আমরা যে একঘরে।'

সত্যিই, সেই একটিমাত্র ঘরে একঘরে থাকতেই তখন যেন ভালো লাগত। বাইরের লোকজনকে মনে হ'ত উৎপাত।

স্নানের পর রোজ সিঁথির পুরনো রেখাটাকে খুঁজে বের করার মতো প্রতিদিন সকালে পুরনো নিয়মগুলোই একের পর এক শুরু হ'ত।

টুনিটার জন্যে সেই বাসা বদলাতে হ'ল। অসুবিধে হ'ত ওটা পেটে আসার পরেই। ছোটো ঘরটাতে তখন ভারি গরম লাগত, থেকে-থেকে যমুনার মনে হ'ত, দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। জামা ঢিলে ক'রে দিত, শুয়ে গায়ে আঁচল রাখত না।

দুপুরে নিজের কাছে নিজে বেহায়া হ'য়ে শুয়ে আছে, সমীর হয়তো তখনই কোনো বন্ধুকে নিয়ে এল। যমুনা তখন কাপড় সামলাবে, না নিজে পালাবে, আর পালাবার মতো আলাদা ঘরই বা কোথায়।

টুনি এসে অসুবিধা আরও বাড়াল। ওটা ট্যাঁ-ট্যাঁ ক'রে কাঁদত। প্রথম-প্রথম মজা পেত সমীর, বাচ্চাটার গাল টিপে আদর ক'রে ভোলাতে চাইত। শেষে বিরক্ত হ'তে শুরু করল। সেসব শান্তির দিন গেছে। টুনিটা সারা রাত ধ'রে চেঁচিয়ে কেঁদেছে, যমুনাও কেঁদেছে মুখ বুঁজে। আর বিনিদ্র বিছানায় চিৎ হ'য়ে সমীর একটার পর একটা সিগারেট টেনেছে।

তখন ভাগ্যে মোটা মাইনের নতুন চাকরিটা হ'ল, নইলে শ্রীধর মিত্তির লেনের খুপরি ছেড়ে এখানে উঠে আসা হ'ত না।

আর বাসা বদলাতে গিয়েই তো ফটোটা বেরিয়ে পড়ল।

সমীর বলেছিল, 'পুরনো জঞ্জাল কিছু নিয়ো না। নেহাৎ যা না হ'লে নয়, তাই নেবে। নতুন বাসায় আমরা নতুন আসবাব দিয়ে ঘর সাজাব।'

সেইজন্যেই যমুনা বাছাই করতে বসেছিল।

নতুন স্যুটকেস দুটোর নিচে ছিল পুরনো একটা তোরঙ্গ— ওটা নাকি সমীরের ছাত্রজীবনের। এতদিন খোলবার দরকার হয়নি।

উঠে আসবার আগের দিন যমুনা বাক্সটা খুলল। প্রথমে নাকে কাপড়

দিতে হ'ল। অনেককালের পুরনো, পোষা, ভাপসা একটা গন্ধ প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এসেছে।

কিছু বই আর কাগজপত্রে তোরঙ্গটা ঠাসাঠাসি হ'য়ে ভ'রে আছে। বইগুলো মুছে-মুছে যমুনা আলাদা ক'রে রাখল। তারপর কাগজের পর কাগজের স্তূপ, কোনোটা কলেজের নোট, কোনোটা চিঠি, সবগুলোই বিবর্ণ মলিন, দরকারী কি অদরকারী যমুনা জানে না। জানলে তো উনুনে ঢুকিয়ে দিয়ে এখনই নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

তখনই ছবিটা হাতে পড়ল।

অনেক নিচে চাপা প'ড়ে ছিল ব'লেই বুঝি সময় বা সময়ের চর পোকা ছবিটাকে নষ্ট করতে পারেনি। কাঁচটা ঈষৎ ঝাপসা হ'য়ে এসেছিল, আঁচল দিয়ে মুছতেই যার ছবি তাকে দেখা গেল।

কুড়ি কি বাইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে, ফটো দেখে রং বোঝা যায় না, তবু মনে হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ; চোখ দুটি মায়াবী, মুখশ্রী কোমল।

মেয়েটি হাসছে। সামান্য একটু হাসি, যা ঠোঁটের কোণটুকু ছুঁয়ে থাকে, কিন্তু সারা মুখে ছড়িয়ে যায় না, রহস্যের ঈষৎ ইশারা দিয়ে মানুষটাকে একই সঙ্গে দূরের আর কাছের ক'রে তোলে।

ঠিক তখনই সমীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ছবিটা তুলে ধ'রে যমুনা বলল, 'দেখ তো, এটাও জঞ্জাল নাকি, নতুন বাসায় কি নিয়ে যাবে ?'

সমীর যদি বলত, 'নিয়ে চলো', তা হ'লেও যমুনা সবটা বুঝত না। তা তো না, সমীর হাত বাড়িয়ে ছবিটা ছিনিয়ে নিল। কোনো জবাব দিল না। এতদিনের এত চেনা মানুষটা হঠাৎ কেমন কঠিন আর হিংস্র হ'য়ে গেছে। যমুনা ভয় পেল।

আজ এতদিন পরে প্রমীলার ফটোটার দিকে চেয়ে যমুনা মনে-মনে বলল, 'বেশ তো ছিলাম, তোমার পরিচয় যতদিন জানিনি। কেন যে সব-জানার সর্বনাশা সাধ আমাকে পেয়ে বসল।

'নতুন বাসায় সত্যিই নতুন আসবাব এল। জানলায় নীল পর্দা ঝুলিয়ে দিলাম। ফুলদানিতে রাখলাম ফুল। আর একটি কোণে জলে আর রোদে আর হাওয়ায় একটি লতা দিনে-দিনে পাতা মেলে বড়ো হ'ল।

'কিন্তু স্কাই-লাইট ছিল না ; সকালেও সবুজ জ্যোৎস্নায় বিছানা ভ'রে যেত না।

'রোজই ও বাসায় ফেরবার সময় কিছু-না-কিছু কিনে আনত। ঘর সাজাবার টুকিটাকি ; কিংবা উপহার। আমার হাতে তুলে দিয়ে ও হাসত। হাসতাম আমিও, কিন্তু তোমার কথা ভুলিনি।

'রোজই দুপুরে না ঘুমিয়ে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। যদি কোথাও একটু হদিস মেলে। পাওয়া যায় এক টুকরো চিঠি, কিংবা একটি নাম। যার মায়াবী চোখ দুটিকে ফটোর ফ্রেম ধ'রে রেখেছে, তার পরিচয় যে আমাকে জানতেই হবে।'

যমুনার মনে পড়ল, সেই সময়ে সমীর ওকে আরও বেশি আদর করত। প্রায়ই অনুযোগ করত, 'তুমি রোগা হ'য়ে যাচ্ছ।'

রোগা হবে না, পেটে তখন আরেকটা শত্রু এসেছে যে। খবরটা টের পেয়ে সমীর বলল, 'আবার ?'

মাথা নিচু ক'রে যমুনা বলল, 'আবার।'

সমীর এমন ভাব দেখাল যেন সে খুশি হয়েছে। আসলে কিন্তু বিরক্তই হয়েছিল। অফিসে বেরুবার সময় পান না পেয়ে সেদিন বিশ্রীরকমের রাগারাগি করেছিল।

সেই রাগটা মাসকাবারে ফেটে পড়ল আরও কুৎসিতভাবে। যমুনা

বুঝি বলেছিল, 'দেখ, এ-মাসে আমাকে আরও কয়েকটা টাকা বেশি দিয়ো।'

'বেশি ! কেন ?'

'দুধ-টুধ, আরও নানা খরচাই তো বেড়ে গেছে, আমি আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

'রাবণের গুষ্টিতে ঘর ভ'রে ফেললে আরও পারবে না।' এমন কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল সমীর, যেন দায়িত্বটা যমুনার একার।

একটু-একটু ক'রে সংসারের চেহারাই যেন বদলে যাচ্ছিল। সমীর যেন আলাদা মানুষ। কিংবা আলাদা নয়, মানুষটার এদিকটা যমুনা আগে দেখতে পায়নি। যেমন গরমে যখন রোদ পায় মানুষ, পৃথিবীর শীতকালের দিকটা তখন উল্টো দিকে থাকে।

সম্পর্কের ঋতুচক্রে ধীরে-ধীরে ঘুরে গিয়ে সেই শীতকালটা আজ এসেছে।

ভাতের থালা মাঝে-মাঝে ঠেলে দেয় সমীর, বলে, 'একেবারে মুখে তোলা যায় না যে। এতটা ধ'রে গেল কী ক'রে।'

দোষ তো যমুনার নয়, দোষ তার ঘুমের। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি ঘরে এসে শুয়ে পড়তে হয়েছিল তাকে। কখন ভাত ধ'রে গেছে টের পায়নি।

ঝোলের বাটি মুখে তুলে সমীর বলে, 'পানসে। পানসে।' বলে, 'কাল থেকে হোটেলে খেয়ে আসব।'

যমুনা আজ নিজেকে বলল, 'তাতেও আমি মনে কিছু করিনি ; বা, করলেও মুখ বুঁজে থেকেছি। কিন্তু সেদিন অমন অপমান কেন করল।

'কেন লুকিয়ে-লুকিয়ে খুলল সেই পুরনো বাক্সটা, ফটোটা বের করল। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ও টের পায়নি। কাঁচের ফ্রেমের ওপর

আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিল। গাঢ়, খুব নিচু গলায় ওকে একবার বলতে শুনলুম, "প্রমীলা!"

'হঠাৎ কী ক'রে শব্দ ক'রে থাকব, ও চমকে পিছন ফিরে চাইল। লুকোতে গেল ছবিটা।

'আমি শান্ত সংযত গলায় বললুম, "দাও, ছবিটা দাও।" আগের দিন ও ছিনিয়ে নিয়েছিল, আজ আমার ছিনিয়ে নেবার পালা।

'ছবিটা হাতে নিয়ে চ'লে যাচ্ছি, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ও অসহায়ের মতো চেয়ে আছে। ওর চোখে স্পষ্ট দুশ্চিন্তা আঁকা, স্পষ্ট দেখলুম। বোধ হয় ভেবেছিল, ছবিটা আমি চুরমার ক'রে ভেঙে ফেলব।

'ও আমাকে চেনেনি।

'খানিক পরে শোবার ঘরে ও যখন চুপে-চুপে ফিরে এল, তার আগেই ফটোটাকে আমি সযত্নে মুছে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছি। ফ্রেমটাকে ঘিরে দিয়েছি একছড়া মালায়। মালাটা আমার খোঁপায় ছিল।

'ওকে বললুম, "চুরি ক'রে আর দেখবে কেন, এখন থেকে রোজ এখানে দাঁড়িয়েই তোমার প্রমীলাকে দেখো।"

'তখনও মাত্র নামটাই জানি।

'ও মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখলুম এই সুযোগ। এইবার জেরা ক'রে-ক'রে গোপন কথাটি জেনে নেব।'

যমুনার মনে আছে, সমীর প্রথমে বলতে চায়নি। কিন্তু ছাড়েনি যমুনাও। কাছে ঘেঁষে এসেছে, সমীরের কাঁধে হাত রেখে বলেছে, 'বলো না, বলো না গো, প্রমীলা তোমার কে।'

সমীর স'রে যেতে চেয়েছে। বলেছে আস্তে-আস্তে, 'জানতে চেয়ো না, জেনে তুমি সুখী হবে না।'

চেষ্টা ক'রে যমুনাকে খিলখিল ক'রে হেসে উঠতে হয়েছে। '—কেন, ও কি আমার সতীন। বলো না, আমাকে বিয়ে করবার আগে তুমি কি প্রমীলাকে বিয়ে করেছিলে।'

গম্ভীর গলায় সমীর বলেছে, 'না, আমাদের বিয়ে হয়নি। হ'তে পারেনি।'

'বাধা ছিল বুঝি ?'

ফটোটার দিকে চকিতে চেয়ে সমীর বলেছে, 'হ্যাঁ, দুস্তর বাধা।'

যমুনা বলেছে, 'ও।' তারপর নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারেনি, পরিহাসের মিথ্যে মুখোশ খসিয়ে দিয়ে ব'লে উঠেছে, 'আমাকে এতদিন বলোনি কেন ? প্রমীলাকেও ডেকে আনো না ! তা, এই একটিই, না আরও অনেক আছে ? একটি, দুটি, তিনটি ? দশটি, না বিশটি ?'

পাথরের মতো চুপ হ'য়ে সমীর দাঁড়িয়ে আছে দেখে হিংস্র হাতে তাকে ধাক্কা দিয়ে যমুনা বলেছে, 'বলো না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বলোই না।'

সেই আকস্মিক আক্রমণে সমীরেরও স্থৈর্য টুটেছে। সেও কটুকণ্ঠে ব'লে উঠেছে, 'সে-হিসেবে তোমার দরকার ? বেশ, জেনে রাখো, অনেক —অনেক ছিল। তুমি কি ভাবো মন্ত্র প'ড়ে উলু দিয়ে তোমার সঙ্গে ওরা যখন আমাকে শুইয়ে দিয়ে গেল, তার আগে আমি কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে চাইনি ?'

সমান জোর দিয়েই যমুনা বলেছে, 'শুধুই চেয়েছ, না চেখেছ ?'

'চুপ করো', সমীর এবার ধমক দিয়ে উঠেছে, 'যার তুমি পায়ের নখের যোগ্য নও, তাকে নিয়ে বিশ্রী ঠাট্টাগুলো কোরো না।'

আশ্চর্য, যমুনা আজ টেবিলে মাথা রেখে ভাবল, 'তখনও আমার সাধ হয়নি যে, ছবি হই। আজ কেন হ'ল।

'আমি কি বিনিটাকে বিয়োবার অপেক্ষায় ছিলুম। তাই যদি হয়, তবে ভালো করিনি।

'কেননা, বিনিও হ'ল, আমিও বিছানা নিলুম। মন তো কবেই ভেঙেছে, শরীরটাও একেবারে ভেঙে পড়ল। সংসারের কাজে আরও খুঁত হ'তে থাকল।

'ফটোটা কিন্তু র'য়ে গেল ওই দেয়ালেই। উঠতে বসতে চোখে পড়ে। আমার, আমার স্বামীর। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে হয়তো ফটোটার সামনে গিয়েও থমকে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে। কী দেখে। আমাদের মধ্যে কে বেশি সুন্দরী?

'দেখুক, আমি ভেবেছি, ও যদি বাড়াবাড়ি কিছু না করে, আমিও করব না। যা উবে গেছে তার জন্যে হা-হুতাশ ক'রে লাভ কী, যেটুকু আছে তা দিয়েও একটা সংসার চ'লে যায়।

'তবু তো সেই চূড়ান্ত ঘটনাটা আজই ঘটল।

'একমাস ভুগে আজই প্রথম তো পথ্য করেছি। বিকেলে কী খেয়াল হ'ল, গা ধুয়ে এসে পরলুম একটা ডুরে শাড়ি। মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালুম। এখনই ওর আসবার কথা আছে।

'ও এল। মুখ কালো, হয়তো ক্লান্ত, হয়তো কারও সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে। পা থেকে মাথা অবধি আমাকে একবার দেখে নিল। তারপর বিরস গলায় বলল, "দেখ, তুমি আর এভাবে সাজগোজ কোরো না। করলেও বাইরে দাঁড়িয়ো না।"

'প্রথম সম্ভাষণ এই? জ্ব'লে গিয়ে বললুম, "কেন।"

' "বোঝো না, কেউ ফিরেও তাকাবে না ব'লে।"

'আমি কাঁপছিলুম। মুখে কথা ফুটছিল না। কোনোক্রমে রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "কী, আমি বাইরে দাঁড়াই, লোকে তাকাবে ব'লে?"

'ও কিছু না ব'লে ঘরের ভিতরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, "ছোটো-লোক, অভদ্র, ইতর।"

'ও শান্ত গলায় বলল, "তোমার সম্মানের জন্যেই বলেছি। তুমি বোধ হয় জানো না, তোমার বয়স বাড়ছে। ওসব সাজ আর মানায় না।"

'ওকে তখন টেনে এনেছি ফটোটার সামনে। বিবেচনাহীন পাগলের মতো চিৎকার ক'রে বলেছি, "বয়স বুঝি একা আমারই বাড়ছে? তোমার প্রমীলা বুঝি ছুঁড়ি, বয়স বাড়ে না?"

' "না।" কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে আগেকার মতোই অবিচলভাবে ও বলেছে, "না, বাড়ে না।"

'কান্না পেয়েছে, তবু অত্যন্ত তীব্র, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠেছি, "তোমার প্রমীলা বুঝি উর্বশী?"

'ঠাট্টাটায় কান না দিয়ে ও বলেছে, "বাড়ে না, বাড়বার উপায় নেই ব'লে।"

' "কোথায়, কোথায় সে।"

'ওকে আস্তে-আস্তে বলতে শুনেছি, "কোথাও না। কিংবা জানি না, হয়তো উপরে, স্বর্গে। তিনদিনের জ্বরে মারা গেছে। আমাদের বিয়ের ঠিক দেড় বছর আগে।" ব'লে আর দাঁড়ায়নি, জামা গায়েই ছিল, ও আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

তারপর এই এত ঘণ্টা কেটে গেল, এখনও ফেরেনি সমীর। চুপ ক'রে ব'সে থেকে-থেকে যমুনার সমস্ত রাগও যেন জুড়িয়ে গেছে। বন্যার জল যেমন বাড়ে, তেমনই একটু-একটু ক'রে রাত বেড়েছে। আর, ক্লান্ত যমুনা ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে আপন মনেই বলেছে, 'আমিও ছবি হ'য়ে যাব।'

এতদিনে সে টের পেয়েছে, কোথায় প্রমীলার জোর। সে যে ছবি। ছবি হ'য়ে আছে ব'লেই তার বয়স কোনোদিন বাড়বে না, রূপ ঝ'রে পড়বে না ; বছর-বছর বাচ্চা বিইয়ে ফতুর হবে না ; মায়াবী চোখ আর ঠোঁটের হাসি অবিকল থাকবে। ছবি ব'লেই সংসারের খরচ নিয়ে কথা কাটাকাটি ক'রে স্বামীর চোখে সে ছোটো হ'য়ে যাবে না। স্বামীকে কারণে-অকারণে সন্দেহও করবে না। আর চিত্তের সমস্ত মাধুর্য নিয়ে ওই ফ্রেমের বাঁধনে চিররূপা হ'য়ে থাকবে।

এই অসম প্রতিযোগিতায় যমুনার হার তো হবেই। তাই, এই নিরিবিলি রাত্রে, কোথাও যখন সাড়া নেই, শব্দ নেই, যমুনা ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে, প্রমীলার ফটোর দিকেই চেয়ে, মৃদুস্বরে বলল, 'আমিও ছবি হ'য়ে যাব। ও দেয়ালে ঝুলিয়ে দেবে আমাকেও। আমি প্রমীলার সমান হব।'

আবার বলল, এবার আরও মৃদুস্বরে, 'এতদিন বুঝিনি, যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন ভয়। ভয় দেহ নিয়ে ; কেননা, সুখ শখ, সব দেহেরই। ভয় আবার দেহটাকে খোয়াবারও। অথচ, মৃত্যুই দেহোত্তর জীবন, আর সেই জীবনই সম্পূর্ণ। কারণ কিছুই খোয়ানোর ভয় তখন নেই।'

স্থির, অকম্পিত হাতে যমুনা মালিশের শিশিটা মুখের কাছে নিয়ে এল।

. . . . . . . . . . . . . . . .

# কোনো কুলবধূর কথা

একেবারে নতুন লোক।

ওকে এ-পাড়ায় কখনও দেখিনি। প্রথম দিন যখন এল, তখন ভাদ্রের ভরা-দুপুর, চড়া রোদ, চারদিক খাঁখাঁ করছে। আমাদের বারান্দার রেলিঙে একটা কাক, রকে একটা কুকুর, রাস্তায় ক্বচিৎ একটা ফিরিওয়ালা।

ছেলেমেয়েরা কখন ইস্কুলে গিয়েছে, উনিও এই খানিক আগে নিত্যকার পানটি মুখে পুরে নিত্যকার অফিসে গেলেন। সব পাট চুকিয়ে আমি স্নান সেরেছি, কাপড় শুকোতে দেব ব'লে এসেছি বাইরে। তারটা বড়ো উঁচু, সহজে নাগাল পাইনে, বুড়ো আঙুলে ভর দিয়েও না। চাকরটাকে বলি, ওটা নিচু ক'রে দিস, সে বলে দেব, দেয় না, বা দিতে ভোলে, এদিক-ওদিক চেয়ে আমাকে রোজই ছোট্টো একটু লাফ দিতে হয়। তিন ছেলের মা, ছি।

সেদিন লাফিয়েও তারটা ছুঁতে পারলুম না, ব্লাউজটা ফস্‌কে পড়ল একেবারে নিচে। ঝুঁকে প'ড়ে দেখছি, কোথায় পড়ল, নর্দমায় না রকে, তখনই লোকটাকে দেখতে পেলুম।

নতুন লোক ব'লেই দেখলুম, নইলে চেহারা এমন কিছু চোখে পড়বার মতো নয়। সামনের যে-বাড়িটা আজ মাসখানেক ধ'রে খালি প'ড়ে আছে, সেটাকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছে। দরজা-জানলা সবই বন্ধ, তবু লোকটি একটু ইতস্তত ক'রে এগিয়ে গেল, দু-ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল রকে। দরজাটাকে আস্তে-আস্তে ঠেলল একবার। খুলল না।

জোড়া কড়ায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে তাও কি লোকটা দেখতে পায়নি।

অবাক হ'য়ে আমি নতুন মানুষটার বিচিত্র কাণ্ডটা দেখছিলুম। একটু হয়তো মজাও পেয়ে থাকব। নইলে, ব্লাউজটা কুড়িয়ে আনতে চাকরকে তো নিচে পাঠিয়েই দিয়েছিলুম, ওখানে আর দাঁড়াবার দরকার ছিল না।

দরজা খুলল না। একটু অপ্রতিভ একটু বা হতাশ হ'য়ে লোকটা রক থেকে নেমে ফের পথে এসে দাঁড়াল। ঘাড় উঁচু ক'রে বাড়িটাকে আবার দেখল খানিক, চোখ নামিয়ে নিল। আসলে বোধ হয় নামাতেই হ'ল। মেঘের খোসা খ'সে গিয়ে তখন রোদ্দুরের হলদে শাঁস বেরিয়ে পড়েছে, বাড়িটাও উত্তরমুখী, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। একবার মনে হ'ল ওর চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করছে। হয়তো অক্ষম লোভে। কিংবা রোদেরই জ্বালায়।

যেদিক থেকে এসেছিল, লোকটি সেদিকে ফিরল না, সামনের দিকে চলতে শুরু করল। তবে জোরে-জোরে পা ফেলে নয়, যদিও ওর বয়সী পুরুষের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক হ'ত। আস্তে-আস্তে এগচ্ছিল, মাথাটা সামনের দিকে হেলানো, যেন কী ভাবছিল। যেন যারা দেড়শো দু-শো টাকার জন্যে রোজ সকালে সময়কে বাঁধা রেখে ফের সন্ধ্যায় খালাস ক'রে আনে, ও তাদের একজন নয়। অঢেল সময় ও অনায়াসে অপচয় করতে পারে, পুরোপুরি না খেয়ে দু-তিনটে সিগারেট যেমন ইতিমধ্যে ছুঁড়ে ফেলে-ফেলে নষ্ট করেছিল, তেমনই। একটা গাড়ি আসছিল, জায়গা বেশ ছিল, তবু লোকটা স'রে একেবারে ড্রেন ঘেঁষে দাঁড়াল। দাঁড়াতে চায় ব'লেই নিচু হ'য়ে জুতোর ফিতে বেঁধে নিল। নইলে আমার সন্দেহ, বাঁধবার দরকারই ছিল না।

ফিতে বাঁধল, রুমালে ঘাম মুছল, ফিরে দাঁড়াল। তারপরে অবাক হ'য়ে দেখি, লোকটা আবার এদিকেই আসছে।

আসুক, আমার কী। আমি তো দোতলায়, বারান্দার রেলিং শক্ত ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছি।

দেখলুম, বন্ধ বাড়িটার পাশের ছোটো দোকান থেকে লোকটা সিগারেট কিনছে। কিনল, কিন্তু ধরাল না, কেননা, আমি অনুমান করলুম, ওর পকেটের পুরনো প্যাকেটটায় নিশ্চয়ই এখনও সিগারেট আছে। পয়সা দিতে-দিতে লোকটি দোকানীকে কী জিজ্ঞাসা করল, আঙুল দিয়ে ইশারা করল বাড়িটার দিকে, দোকানীও কী যেন জবাব দিল, আমি শুনতে পেলুম না।

নতুন লোকটি ততক্ষণে ফের চলতে শুরু করেছে। এবার আগেকার মতো ঢিমেতালে নয়, ব্যস্তভাবেও নয়, স্বাভাবিক চালে।

আমার এখনও অনেক কাজ বাকি। ভিতরে যাব, শোবার ঘরের বড়ো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে বড়ো ক'রে সিঁদুরের একটি ফোঁটা পরব। রোজ যেমন পরি। লক্ষ্মীর পটের সামনে ব'সে স্তব পড়ব। সব শেষে হেঁশেলে যাব, এক থালা ভাত বেড়ে নেব, আরেক থালা আলাদা ক'রে রাখব, ওটা চাকরের। এত বেলায় খিদে থাকে না, পিত্তি প'ড়ে যায়, তবু খাই। মাছের ল্যাজা আর পুঁইচচ্চড়ি দিয়ে পুরো থালাটাকেই শেষ করি। খাওয়াটা আজকাল যেন পুষ্টির জন্যে নয়, নেশার জন্যে ; নইলে দুপুরের ঘুমটুকু হয় না। না হ'লে মাথা ধরে, থেকে-থেকে তেষ্টা পায়, গা ম্যাজম্যাজ করে। বিকেলের খাটুনি খাটতে পারি না। কিন্তু যেই ভর-পেট খাওয়া হ'ল, অমনই টুপ ক'রে একটা পান ফেলে দিলুম গালে, ঠোঁট টুকটুকে হ'ল কি না একবারটি দেখে নিয়েই পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম নিচে। হাতপাখাটা হাতে নিয়ে প্রথমে তার ডাঁট দিয়ে মারলুম

গলার ঘামাচি, জামা-টামা একটু আলগা ক'রে দিলুম, এখানে আর কে দেখছে। তারপর হাতের পাখা হাতেই থাকে, হাওয়া খাওয়া বিশেষ হয় না, চোখ জড়িয়ে আসে, পাখাটা ঠকাস ক'রে মাটিতে পড়ে, চমকে উঠি, ফের চোখ বুঁজি। জানি, একটু পরে আমার নাক ডাকবে, ভিজে এলো চুলের ডগা শুকোবে, কিন্তু গোড়া ঘামে আরও জবজবে হবে। সিঁদুরের ছোট্টো ফোঁটাটা ছড়িয়ে-ছড়িয়ে রক্তজবার মতো দেখাবে।

আমার নাকি নাক ডাকে। উনি বলেছেন। ওঁরও ডাকে। আমি শুনেছি। কিন্তু নিজেরটা কেউই শুনিনি। ভগবান অন্তত দুটো ব্যাপারে আমাদের অসীম করুণা করেছেন। এক, নিজের চেহারা অহরহ দেখতে পাই না। দুই, নিজের নাকের ডাক শুনি না। নইলে মানুষ আরও অনেক বেশি দুঃখ পেত।

লোকটাকে কেন প্রথম দিনই চোখে পড়েছিল, পরে অনেকবার ভেবেছি। একটা কারণ, নতুন ব'লে। আমাদের এই নির্জন গলিতে বাইরের লোকজন তো বেশি আসে না। জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকে, দুপুরে বউ-ঝিরা প'ড়ে-প'ড়ে ঘুময় ব'লে ফিরিওয়ালার ভিড়ও কম। যে-ক'জন আসে, তাদের আমি চিনি। একজন আসে সকালের দিকে, দুয়ারে-দুয়ারে পুরনো কাগজ চেয়ে-চেয়ে ফেরে। একটু বেলায় এসে একজন হাঁকে, 'চন্দন' ধূ-উ-প।' তারও অনেক পরে, একজন পিতলের বাসন মাথায় ক'রে একটা বাটি কাঁসরের মতো বাজিয়ে জানান দিয়ে চ'লে যায়। একই পশ্চিমা লোক শীতকালে কমলালেবু আর গরমে আম ব'য়ে আনে। মাঝে-মাঝে আসে শিল-খোদাই। এদের সকলকেই আমি চিনি। কিনি না-কিনি, ডাক শুনলেই বারান্দায় এসে দাঁড়াই। চিনি খেলনাওয়ালাকেও, ঝুমঝুমি বাজিয়ে যে রোজ গলিটা পার হ'য়ে

যায়। বেলফুলওয়ালা আসে না, এ-পাড়ায় ফুল-টুলের শখ কারও নেই।

এরা ছাড়া বাইরের লোক আসে কদাচিৎ। সেই কবে গলা অবধি ঘোমটা ঢেকে শঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যে মোটর থেকে নেমেছিলুম, পা কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল, চোখের পাতা বুঁজে আসছিল, তারপর আট-দশ বচ্ছর হ'য়ে গেল, আমি প্রথম দু-বার বাচ্চা বিইয়ে রোগা আর শেষবারে থপথপে মোটা হ'য়ে গেলুম, কত চুল উঠে গেল, লুকিয়ে-লুকিয়ে পাকল কত, কিন্তু গলিটা একটুও বদলাল না তো।

সেই সকাল হ'তে না হ'তে কারা ঘোলা জলের নল খুলে রাস্তা ধুয়ে দিয়ে যায়, কেউ উঠে পড়বার আগেই তারা স'রে পড়ে, রাতজাগা গ্যাসের আলোটা ক্লান্ত চোখ বোঁজে। বিজলী তারে ওই ঘুড়িটা, মনে হয়, এ-গলির জন্মদিন থেকেই ওখানে লটকে আছে। রোদে জলে কাগজের রংই শুধু একটু-একটু ক'রে ধুয়ে গেছে। মোড়ের হলদে রঙের বাড়িটা—প্রথম দিন থেকেই দেখছি ছাতের কার্নিসের খানিকটা ভাঙা, আজও ভাঙাই আছে। মেরামত করার কথা কারও বুঝি একবারও মনে হয়নি। অন্যের কথায় কাজ কী, আমাদের এই বাড়িটারই তো সদর দরজার ছিটকিনি ভাঙা, একটু হাওয়া হ'লেই কবজাগুলো কুকুরের মতো কেঁউ-কেঁউ করে, তখন ভাবি, আর নয়, কালই মিস্ত্রী ডেকে সারিয়ে নেব, কিন্তু পরদিন ভুলে যাই। একটি দিন হুবহু আর সব ক'টি দিনের মতো ; যেন মিলে তৈরি শাড়ি, রঙে, নকশায়, আকারে এক।

ছোট্টো পাড়া তো, এ-গলির লোকজনদেরও আমি চিনে ফেলেছি। কর্তাদের বেশির ভাগই সদাগরি অফিসের জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ কেরানী। সকালে বাজার করেন, বাজার থেকে ফিরে অফিস। ঘাড়ের কাছে হলদে ছোপ-ধরা পাঞ্জাবি, মুখে পান। সন্ধ্যার মুখে সবাই বাড়ি ফেরেন।

আমার স্বামীও। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেলেই বুঝি, ছ'টা বেজেছে— দু-পাঁচ মিনিট এদিক-ওদিক হ'তে পারে।

আমারও গা ধোয়া হ'য়ে যায় তার আগেই। উনি আসেন, একটু হাঁপান, হাসেন, কোঁচার খুঁট ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হাওয়া খান, ক্যাম্বিস কাপড়ের চেয়ারটায় গা ঢেলে দেন। ঘাম শুকোলে হাত বাড়িয়ে বলেন, 'দেখি।'

না, না, আমাকে না, আমাকে চান না, তখন চান না, রাত না হ'লে চাইতে নেই। উনি জলের গ্লাসটা চান।

আমি গ্লাসটা ওঁর হাতে তুলে দিই। ঢকঢক ক'রে সবটা খেয়ে উনি বলেন, 'আঃ।' কোনোদিন বা আমার কপালের যত্ন ক'রে পরা টিপটাও চোখে পড়ে। বলেন, 'বাঃ।' অব্যয় দুটির প্রথমটি তৃপ্তির, পরেরটি প্রশস্তির।

তখন ওঁর আর কিছু চাই না, সকালে খবরের কাগজটাতে শুধু চোখ বুলিয়ে অফিসে গিয়েছিলেন, এখন সেটা আদ্যোপান্ত পড়বেন।

সেই অবসরে আমি একটিবার বাইরে এসে দাঁড়াব। আকাশের প্রথম তারাটিকে দেখব। টবে অনেক যত্নে কয়েকটি বেলফুল ফুটিয়েছি, তার একটিকে খোঁপায় পরব। দশ বছর ধ'রে এই একটুখানি ছেলেমানুষি নিজের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি।

আশেপাশে তাকালে যে কয়টি বাড়ি চোখে পড়ে, বুঝি তার একটিও আমাদের থেকে আলাদা নয়। এক ছাঁচে ঢালা মানুষ, একই গলির খাপে বন্দী, তাদের কাজের ফিরিস্তিও তো একই রকমের হবে।

এরা সকলেই বাড়ি ফিরে এক গ্লাস জল, আর গা ধুয়ে ফিটফাট, সিঁদুরের টিপ-পরা বউকে পায়।

পায়, কোনোদিন নেয়, কোনোদিন নেয় না। কিন্তু ঠিক সময়ে

ঘুময়। কলের যে ঘড়ি, সে-ও কখনও দেরি ক'রে ফেলে, দম ফুরিয়ে বিকল হয়। এরা দেরি করে না, বিকল হয় না। কেননা, মনে ভয় আছে। পাছে সকালে উঠতে দেরি হয়, দেরি হয় বাজার করতে, অফিসে যেতে! নিয়মের যে-শিকল দিয়ে এরা সময়কে বেঁধে রেখেছে, গিঁট আলগা হ'য়ে সেটা যদি খুলে যায়?

কথায়-কথায় কোথায় এসে পড়েছি। বলছিলুম ওই নতুন লোকটার কথা।

বিয়ে, বিয়োনো, আর দু-একটি মৃত্যু ছাড়া আর-কিছুর নড়চড় আজ অবধি যেখানে হয়নি, আমাদের সেই পাড়ায় হঠাৎ একটা বাড়ি খালি হ'ল। সেই বাড়িটা দেখে গেল লোকটা।

সুপুরুষ নয়, আগেই বলেছি। রোগা হ্যাংলা, মাথায় খাটো, মুখের রং কেমন পোড়া-পোড়া, ঝলসানো। এ-পাড়ার সব বাবুদের থেকে আলাদা। আলাদা ব'লেই তো চোখে পড়েছিল।

এ-পাড়ার বাবুরা, আমাদের উনিও তাঁদের একজন, প্রায় সকলেই গৌরবর্ণ। শহর পত্তনের কালটা এঁদের পূর্বপুরুষদের চোখে দেখা। কোম্পানির আমলে দাপটও ছিল অনেকের। এখনও বড়ো-বড়ো হৌসে উত্তরাধিকার-সূত্রে এক-একটি ভারি চেয়ার দখল ক'রে আছেন। এঁরা বাড়িতে বাবু, অফিসেও ছোটো, মেজো বা বড়োবাবু। পরিপাটি টেরি কাটেন, চেন-ঘড়িতে সময় দেখেন, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেন ইষ্ট-দেবতাকে, লেট হবার ভয়ে তাড়াতাড়ি পা চালান যখন, চাবির সঙ্গে পকেটের পানভর্তি ডিবেটা ঠোকাঠুকি ক'রে ঠনঠন ক'রে বাজে।

সে-পাড়ায় ওই আঁটো খাকির প্যান্টের খাঁজে ঢিলে শার্ট গোঁজা লোকটাকে একটু বেখাপ্পা লাগে বৈকি।

দ্বিতীয় দিন এল সন্ধ্যার ঠিক মুখে-মুখে। ট্যাক্সি চেপে। নামল ওই খালি বাড়িটার সামনেই।

প্রথম দিন একটু ভীতু, অনিশ্চিত ভাব দেখেছিলুম, আজ সেসবের চিহ্নমাত্র নেই। পকেট থেকে বার করল চাবি, এক মোচড়ে তালা খুলল।

বাসাটা ও ভাড়া নিয়েছে বুঝলুম। বাড়িওয়ালার কাছ থেকে চাবি চেয়ে এনেছে।

স্বামীকে বললুম, 'ও-বাড়িতে বুঝি ভাড়াটে এল।'

স্বামী তখন খবরের কাগজে সোনারুপোর দরের পৃষ্ঠাটা পড়ছিলেন, কিছু বললেন না।

ঠাসঠাস ক'রে ও-বাড়ির জানলাগুলো খুলে গেল, শব্দ শুনলুম। লোকটা তবে ভিতরে গিয়েছে, ঘুরে-ঘুরে দেখছে নতুন বাড়ি, লাইট নেই, ফসফস ক'রে এক-একটি দেশলাই জ্বালছে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই নিবছে সেগুলো। লোকটার মাথা খারাপ নাকি। কাঠি খরচ ক'রে-ক'রে ফতুর হ'য়ে যাবে যে। একটা মোমবাতিও কি সঙ্গে ক'রে আনতে পারেনি?

কিন্তু আমারই বা এ কী হয়েছে, আধ-অন্ধকার বারান্দা থেকে ঝুঁকে প'ড়ে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছি কেন? যত খুশি কাঠি ও জ্বালুক না, আমার কী।

কিছু না। কিন্তু মজাও তো মন্দ না। থাকতে এসেছে, অথচ সঙ্গে মালপত্র কিছু আনেনি। আনলে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে নিত। আরও অবাক কাণ্ড এই, ট্যাক্সিটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ওকে মিটিয়ে দিতেও লোকটা ভুলে গেল নাকি।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলছে, নিবছে, যেন জোনাকি, আর সেই অল্পায়ু, অস্বস্তিকর আলোয় দেখছি একটা ছায়া-ছায়া মানুষ ঘরের ভিতর ঘোরাঘুরি করছে। আগের ভাড়াটেরা কাঠের কোনো ভাঙা জিনিস বুঝি

ফেলে গেছে, লোকটা ঘর্ঘর ক'রে সেটাকে টেনে নিয়ে বাইরে ফেলল। ঝুপঝুপ শব্দ হ'ল একবার, খানিকটা চুনবালি দেয়াল থেকে খসল। ওকে একবার শব্দ ক'রে হেঁচে উঠতেও শুনলুম। হাঁচি হবে না! যা ধুলো জমেছে ঘরটায়, মাসখানেকের মধ্যে ঝাঁট পড়েনি তো।

আমি সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে সব দেখছি, শুনছি। যেন আমাকে আমারই ভিতরকার কেউ মন্ত্র প'ড়ে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ও-বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে।

একটু পরে দেশলাই আর জ্বলল না। ভাবলুম, বাঁচা গেল, ওর সব কাঠি ফুরিয়েছে। এবার খাপছাড়া মানুষটাকে অন্ধকার গিলে খাক।

তা তো নয়, লোকটা এখানে থাকতেই আসেনি। খানিক পরে দেখি, দরজায় ও ফের তালা দিচ্ছে। ট্যাক্সিটা এতক্ষণ ঝিমচ্ছিল, হঠাৎ জেগে উঠে যেন রেগে গেল; জ্ব'লে উঠল ওর দুটি চোখ, গর্জন ক'রে রাতের রহস্যময় সওয়ারীকে ধমক দিল।

পরদিন যতবার রাস্তায় গাড়ির শব্দ হ'ল, ততবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম, মালপত্র নিয়ে লোকটা বুঝি এই আসে, এই আসে।

এল না। সেদিন না, তার পরদিন না। সপ্তাহ ঘুরে গেল, তবু না।

সেদিনও যাবার আগে পানওয়ালার দোকানে সিগারেট কিনেছিল, কী যেন ব'লে গিয়েছিল ওকে। মাঝে-মাঝে লোভ হয় জিজ্ঞেস করি, কবে আসবে বলেছে।

স্বামীকে বলি, 'বাসাটা ভাড়া নিল, তবু এল না, লোকটা কেমন বলো তো?'

স্বামী বলেন, 'তোমার-আমার কী।'

কিছু না। তবু, পাড়ায় নতুন লোক এল, একটু কৌতূহল হয় না?

একটু কৌতূহল, একটু অস্বস্তি, হয়তো একটু হতাশাও। আর কিছু

না। আর সব ঠিক যথাপূর্ব চলছিল। উনি বাঁধা টাইমেই অফিসে বেরুচ্ছিলেন, ফিরছিলেন। ঠিক সওয়া-ছ'টায় সিঁড়িতে ঠকঠক জুতোর শব্দ শুনছিলুম।

সপ্তাহের শেষের দিকে একদিন সন্ধ্যায় মনে হ'ল রাস্তায় ভারি একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তখন কলঘরে ছিলুম, তাড়াতাড়ি একটা শাড়ি জড়িয়ে বেরিয়ে এলুম।

না, ও-বাড়ির নতুন ভাড়াটে নয়।

খেলনাওয়ালা। ঠেলাগাড়ি ক'রে ওর রকমারি বেসাতি এনে আমাদের দরজায় দাঁড় করিয়েছে।

ঠিক তখনই আমার স্বামী ফিরলেন। ছ'টা বেজে এগারো।

কী হ'ল, অসহিষ্ণু গলায় ব'লে উঠলুম, 'আচ্ছা, একদিনও কি তোমার একটুও দেরি হ'তে নেই ?'

উনি অবাক হলেন। ফরসা, গোল, ভরা-ভরা মুখে যেন সামান্য আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখলুম। বললেন, 'কেন, দেরি হবে কেন।'

ততক্ষণে আমিও লজ্জা পেয়েছি। কথাটা আসলে ওভাবে বলাই ঠিক হয়নি। বললুম, 'না, মানে, ধরো, ফেরবার পথে কোনোদিন পুরনো কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, কিংবা—'

বাধা দিয়ে উনি বললেন, 'দেখা হয় না। হ'লে, সারাদিন খাটাখাটুনির পর, সেরকম লোককে দূর থেকে দেখতে পেলেই আমরা পাশ কাটিয়ে যাই।'

'ট্রাম-বাসও দেরি করে না ?'

এবার সগর্ব হাসিতে স্বামীর মুখ ভ'রে গেল। 'করে। তখন নেমে পড়ি, বাকি পথ হাঁটি। সাধে কি বউবাজারে আছি। লালদিঘি থেকে হেঁটে আসতেও লাগে মোট পনেরো মিনিট।'

ঠাণ্ডা গলায় বললুম, 'ও।' ওকে বোঝানো যাবে না মাঝে-মাঝে দেরি— অনেক দেরি— ক'রে ফিরলে কেন ভালো লাগত। সন্ধ্যা থেকে ছটফট করতুম, একবার ঘরে যেতুম, আবার ছুটে বাইরে আসতুম, ঘড়ি দেখতুম ঘন-ঘন, বুক কাঁপত, সেই ভয়ের, সেই সুখের ও কী বুঝবে।

সত্যিই লোকটা একদিন এল। ভোরবেলা নামল একটা রিক্শা থেকে। ময়লা রঙের মুখটা দাড়িতে ছেয়েছে— পোড়ামাটির উপরে খানিকটা ছাই ছড়িয়ে দিয়েছ যেন কেউ। পরনে ডোরাকাটা নীলচে পাজামা— কিন্তু শুনেছিলুম এটা ঘুমবার পোশাক, এসব প'রে কেউ রাস্তায় বেরয় নাকি।

একটা ছোটো সুটকেস, আর নতুন শতরঞ্চি জড়ানো, ওটা কী, বিছানা বোধ হয়, ওর জিনিসপত্র মোটে কি এই। সঙ্গে লোকজনই বা কই। এত বড়ো বাসা ভাড়া নিয়েছে লোকটা, খান চারেক ঘর, একলা বাস করবে ব'লে? সঙ্গে একটা চাকর পর্যন্ত নেই। ওর দেখাশুনা করবে কে, লোকটা খাবেই বা কোথায়। হোটেলে! তবে তো সেখানেই একটা ঘর ভাড়া নিতে পারত— অনেক কম খরচে কুলিয়ে যেত। এখানে কম ক'রে বাড়িভাড়াই শ' খানেকের উপর পড়বে যে।

এমন খামখেয়ালী, অদ্ভুত ধরনের লোক আমি কখনও দেখিনি। দেখিনি ব'লেই দেখতে শুরু করলুম, ফুরসৎ পেলেই এসে দাঁড়াতুম বারান্দায়, অভ্যাসটা যেন নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

দেখি, কোথা থেকে একটা ঝাঁটা নিয়ে এসেছে, প্রাণপণে সাফ করছে ধুলো। কিন্তু দরজাটা বন্ধ ক'রে নেয়নি, হাওয়ায় ধুলোর রাশি ফের সারা ঘরেই ছড়িয়ে পড়ছে, আনাড়ি আর কাকে বলে।

খানিক বাদে বেরিয়ে কোথা থেকে নিয়ে এল একটা টুল, তার উপরে

দাঁড়িয়ে একটা পাখা ঠিক করলে। এসব কাজ দিব্যি জানা আছে দেখছি, লোকটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রী নয়তো? তবে মিস্ত্রী হ'লে কি এমন বাসা ভাড়া নিতে পারত।

খাট নেই, মেঝেতেই বিছানা পাতল পরিপাটি ক'রে। তারপর সব ক'টি বালিশ কোলের কাছে জড়ো ক'রে, বুকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। এবার ঘুমবে। চোখ দেখেই বুঝেছিলুম, ক্লান্ত। ক'রাত্তির ওর ঘুম হয়নি ওই জানে। লোকটা কেমন-কেমন, সে তো প্রথমেই টের পেয়েছিলুম, হঠাৎ মনে হ'ল অসচ্চরিত্রও নয় তো। কোথায় ছিল ভাবতে-ভাবতে ভিতরে গেলুম। সংসারের সব কাজ প'ড়ে আছে।

দুপুরে ফিরে এসে দেখি, তখনও ও প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমচ্ছে। পাশ-বালিশগুলো কখন চ'লে গেছে পায়ের নিচে, মাথারটাও যথাস্থানে নেই, জানলা খোলা পেয়ে খানিকটা রোদ এসে পড়েছে বিছানায়, বিরক্ত লোকটা কনুই দিয়ে মুখ ঢেকেছে, তবু জানলাটা বন্ধ করতে ওঠেনি।

নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কাজ নেই, আছে শুধু প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমনো; যেন আর কোথাও ঘুমতে পেত না, নিশ্চিত মনে এখানে ঘুমতে পারবে ব'লেই কুম্ভকর্ণ লোকটা এত বড়ো বাসাটা ভাড়া নিয়েছে। গড়িয়ে-ছড়িয়ে শোবে ব'লে।

কাকের ডাক শুনছিলুম। মাঝে-মাঝে মনে হয় এই গলিটাই যেন কা-কা ক'রে ওঠে। দূরের আকাশে কলের চিমনিটাও দেখেছিলুম। সারাদিন নিজের কলঙ্ক ও নিজেই রটায়।

তক্ষুনি টের পেলুম, লোকটা উঠেছে। হাই তুলছে। উঠে বসল। তাকাল এদিকেই, আমাদের বারান্দার দিকেই। সর্বনাশ, লোকটা আমাকে দেখে হাসল নাকি। বুক ঢিপঢিপ করছিল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লুম।

সেদিন ঘুমতে পারিনি। আয়নায় নিজেকে দেখেছি। অর্থাৎ নিজের

বাইরেটাকে। আমাকে দেখে হাসবে কেন। তিনটে বাচ্চার মা হ'য়ে থপথপে হ'য়ে পড়েছি, চোখে কালি, চুল পাতলা, আমাকে দেখে লোকের এখন বরং হাসিই পাবে, কিন্তু ওভাবে হাসবে কেন। ওসব হাসি-টাসির পাট কবে চুকে গেছে।

সন্ধ্যাবেলা দেখলুম, ও-বাড়ির দরজায় ফের মস্ত সেই তালা।

ছোটো খুকিটার জ্বর হয়েছিল। সেদিন সারারাত ওকে নিয়ে জাগতে হয়েছে, কিন্তু ও-বাড়ির কোনো ঘরে আলো জ্বলতে দেখিনি। কোন চুলোয় আজ আবার রাত কাটাতে গেল, কে জানে।

লোকটা আবার নিরুদ্দেশ। পুরো মাসটা ঘুরতে চলল, সেই যে সেদিন দুপুরে ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেছে, তারপর থেকে আর পাত্তা নেই। দরজায় বিশ্বাসী তালাটায় জং ধ'রে গেল।

এখানে খাবি না, থাকবি না সে তো টের পেয়েই গিয়েছি, কিন্তু দুপুরেও যদি একবারটি ঘুমতে না আসিস তবে বাসা ভাড়া করা কেন বাপু। মনে-মনে লোকটাকে কত ধমকালুম।

মনে-মনে কেন, আমার স্বামীকেও বললুম। উনি বললেন, 'ক্রিমিন্যাল। লোকে বাসা খুঁজে-খুঁজে হন্যে হ'য়ে যায়, আর ও একটা বাসা নিয়ে আটকে রেখেছে?'

ক্রিমিন্যাল। শুনে-শুনে কথাটার একটা আন্দাজী মানে ধ'রে নিয়েছিলুম। যারা খুনখারাপি, চুরি-ডাকাতি করে, তারাই ক্রিমিন্যাল। আর সেদিন রাত্রেই কথাটার যেন প্রমাণ পেলুম।

চুপিচুপি লোকটা এল, চোরের মতো নিঃশব্দে দাঁড়াল ওর নিজেরই বাড়ির রকে। তালার ফোকরে চাবি লাগাল। ও জানে না, ওকে আর একজন লক্ষ্য করছে। আমি।

নিজের বাসা, তবু ওর এই চোর-চোর ভাব কেন। ভিতরে গেল

লোকটা, এত দিন পরে এসেছে, ঘরে ইঁদুরের আস্তানা আর আরশোলা নিশ্চয়ই হয়েছে, আর ধুলো তো আছেই। তবু ও আলো জ্বালাল না। কালো জলের মতো অন্ধকারে তলিয়ে গেল। আমি অবাক, কাঠ, নিস্পন্দ ; দেখছি।

কারণ নেই, তবু সেদিন একটু যেন ভয় পেয়েছিলুম। বেশ তো ছিল বাড়িটা খালি প'ড়ে, ভাড়াটে এল কেন। এল যদি, সে এমন হ'ল না কেন, যে এখানকার সব-কিছুর সঙ্গে মিলে যায়? সে কেন এমন খাপছাড়া আলাদা ধরনের ; আমরা তো ধ'রেই নিয়েছিলুম, ও পালিয়ে গিয়েছে, দিন দুই ঘুমিয়ে টের পেয়েছে, এত বেশি ভাড়া টানবার সাধ্য ওর নেই, তাই চম্পট দিয়েছে। ভেবেছিলুম, দরজায় আবার 'টু-লেট' নোটিশ পড়ল ব'লে।

পড়বার আগেই ও ফিরে এল কিন্তু। নিজেরই ঘরে ঢুকল, যেন দরজা দিয়ে মাথা সোজা ক'রে নয়, নুইয়ে, সিঁদ দিয়ে।

আর আমার ভয়টাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হ'ল। লোকটা ঘরে ঢোকবার মিনিট কুড়ি পরে আরও দু-জন লোক এসে ও-বাড়ির দরজায় দাঁড়াল, তাদের মুখ দেখতে পেলুম না, ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, তাদের দেহও কেমন ছায়া-ছায়া, ওরা সন্তর্পণে কবাটে টোকা দিল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। লোকটা যেন ওদেরই অপেক্ষা করছিল।

অন্ধকার অবশ্য আগন্তুক দুটিকেও গ্রাস করল। আলো তখনও জ্বলল না।

ক'মিনিট কেটেছিল সেদিন? ঠিক বলতে পারব না। আমার কোলের বাচ্চাটা একবার হঠাৎ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, তাকে থাপড়ে-চাপড়ে ফের ঘুম পাড়িয়ে চ'লে এলুম। টের পেলুম আমার স্বামী একবার

আলো জ্বাললেন, বাথরুমে যেতে। ফিরে এসে বললেন, 'তুমি শোওনি ?'

কথা না ব'লে শুধু ঘাড় নাড়লুম।

'ঠাণ্ডা লাগিয়ো না,' ব'লে উনি ফের গলা অবধি চাদর ঢাকা দিলেন।

আমি নির্নিমেষ চোখে চেয়ে দেখলুম, আগন্তুক দু-জন আবার বাইরে এসেছে, পিছন-পিছন বাসাটা যে ভাড়া নিয়েছে, সে-ও। রকে দাঁড়িয়েই ওরা ফিসফিস ক'রে কী যেন বলাবলি করলে, লোক দু-জন আকাশের দিকে চাইলে, একজন হাত বাড়িয়ে দেখলে বৃষ্টি থেমেছে কিনা, তারপর রাস্তায় নেমে এল।

দরজা আবার বন্ধ হ'ল ভিতর থেকে।

বাদলার রাত, তখনও থেকে-থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, হাত-পা হিম, তবু আমাকে পুরো এক গ্লাস জল খেতে হ'ল। এতদিনে আমি বুঝে নিয়েছি লোকটার স্বরূপ। কত কী-ই তো এতদিন ভেবেছি, কিন্তু এতটা তো কখনও সন্দেহ করিনি।

গোয়েন্দা-গল্প বরাবরই আমার প্রিয়, বিখ্যাত অনেক দস্যু-নেতার কীর্তির কথা পড়েছি। ও নিশ্চয় সেইসব চরিত্রেরই একজন, কোনো গুপ্ত দলের নায়ক ; যারা এসেছিল, তারা তবে কী। ওর চর। এই বর্ষার রাত্রেই ওদের যত কাজ। মুখোশ প'রে, মোটরে চ'ড়ে, ওৎ পেতে থাকে নির্জন রাস্তার মোড়ে। আস্তিনে লুকোনো পিস্তল, সুযোগ এলেই ইস্পাতের নীল নলে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। পর-পর কয়েকটি রক্তাপ্লুত দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

আজ রাত্রে নিশ্চয়ই তেমন কোনো অঘটন ঘটবে কোথাও, এতক্ষণ ধ'রে এই অন্ধকার ঘরে তারই ষড়যন্ত্র হ'ল।

সকালে খবরের কাগজটা তন্নতন্ন ক'রে পড়লুম, কিন্তু রোমহর্ষক একটিও ঘটনার কথা কোথাও লেখা নেই।

তবে কাল যা দেখেছি, তা স্বপ্ন না মায়া।

লোকটার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। জানলার সামনে একটা টেবিল, এক মনে কী লিখছে। লম্বা-লম্বা চুল কপালের খানিকটা ঢেকে রেখেছে, সেগুলো সরাতেই একবার মাথা তুলল, চোখোচোখি হ'ল তখনই। বড়ো-বড়ো চোখ, অত্যন্ত উদাস দৃষ্টি, ঈষৎ ক্লান্ত। সেই ক্লান্ত চোখে কাল রাতে আমার কল্পিত দুর্বৃত্ত দস্যু-নেতার চিহ্নমাত্র দেখলুম না।

তবে কি আমি ভুল করেছি।

একটু আলাদা ধরনের ব'লেই ওকে ভুল বুঝেছি? কী জানি।

আচ্ছা, এমনও তো হ'তে পারে, দস্যু নয়, আসলে উনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা— ওঁর নামে পুলিশের হুলিয়া বেরিয়েছে, ছদ্ম-বেশে তাই গা-ঢাকা দিয়ে আছেন এখানে? বিপ্লবী যুগের কত নেতার বিষয়েই তো এমন কাহিনী পড়েছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু উনি আর ওঁর দলের লোকেরা যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক তেমন হয়নি। তাই গোপনে-গোপনে আজও বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে পরামর্শ করেন, কোন পথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। ওঁরা যা করছেন, সে-কাহিনী আজ তো জানা যাবে না, যদি যায় তো অনেক বছর পরে। হয়তো একদিন খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওঁদেরই কীর্তিকাহিনীতে মুখর হবে। কাল রাতে ভয় পেয়েছিলুম, আজ সকালে শ্রদ্ধায় আমার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে গেল।

অসভ্য, বদমাশ, বর্বর।

আমি হাঁপাচ্ছিলুম। ফুঁসছিলুম ঘরে ফিরে, জানলার শিক ধ'রে। আমার বিষ নেই, ছোবল নেই, থাকলে ঢেলে দিতুম, ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে আসতুম। বুঝিয়ে দিতুম, পরের ঘরের বউয়ের দিকে তাকিয়ে

মিটমিট ক'রে হাসবার সাজা কী। চোখ তুলে কোনো অপরিচিত মেয়ের দিকে চাইবার সাহস ওর আর কোনোদিন হ'ত না।

আজ সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। আমার মরণও হয় না, কেন যে ওর ঘরের দিকে এতবার চাই। ও কি চুম্বক, না জাদু জানে'।

আজও কী লিখছিল, মাথা নিচু ক'রে, কিন্তু খারাপ লোক তো, একটা বাড়তি চোখ ওদের মাথার পিছনে থাকে। টের পেয়ে থাকবে, আমি এসে দাঁড়িয়েছি। দেখলুম, লেখা ফেলে উঠে দাঁড়াল, এল জানলার সামনে, আর, আমি নির্ভুল দেখতে পেলুম, আমার দিকে চেয়ে, আমারই চোখে চোখ রেখে, বিশ্রী, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হেসে উঠল। আমার ভুল হয়নি; আমরা, মেয়েরা, এমনকি মায়েরাও, ওসব চাউনি চট ক'রে চিনি, ওসব হাসির মানে ঠিকই বুঝে নিই।

আরও সাহস দেখ লোকটার, সিগারেট ধরাল একটা, ধোঁয়াটাকে জিভ দিয়ে দড়ির মতো পাকিয়ে-পাকিয়ে জানলার বাইরে, যেন আমাকেই লক্ষ্য ক'রে, ছুঁড়ে দিতে থাকল। হঠাৎ শুনলুম, ও গান গাইছে।

'কী মোহিনী জানো বঁধু,
কী মোহিনী জানো।
অবলার প্রাণ নিতে
নাহি তোমা হেন।'

এসব গান ভদ্রসমাজে কেউ গায় না। ওর গলায় সুর নেই, কিন্তু জোর বিলক্ষণ আছে। অসুরদের থাকে।

কী ভেবেছে ও। আমি যে মাঝে-মাঝে বাইরে এসে দাঁড়াই, সে তো কাজ থাকে ব'লে। কাপড় শুকোতে দিই, দরকার হ'লে ফিরিওয়ালাকে ডাকি। তা ছাড়া ঘরের ভিতরে ব'সে থেকে-থেকে হাঁপ ধ'রে যায় না? হলামই বা মেয়েমানুষ, তাজা হাওয়া খেতে আমাদেরও কি সাধ হয় না?

আমার উচিত ছিল, তক্ষুনি ঘরে চ'লে আসা। অথচ আসিনি। যতক্ষণ না ওর গান শেষ হ'ল, সিগারেটটা টেনে-টেনে শেষ ক'রে এনে বাইরে ছুঁড়ে দিল, ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ফুঁসছি এখন, এই ঘরের মধ্যে ফিরে এসে। সাপিনী যেমন ক'রে লেজ আছড়ায়, তেমনই অক্ষম রোষে ফুলছি।

লম্পট, বদমাশ একটা, ওকেই কিনা আমি লাঞ্ছিত, বিপ্লবী নেতা মনে করেছিলুম ? মেয়েমানুষের আর কত বুদ্ধি হবে।

ওকে আমি চিনে নিয়েছি কাল বিকালেই।

কড়কড়ে পাৎলুনের উপর হাওয়াই কামিজ চাপানো, আজকালকার যা ফ্যাশন ; চুল পরিপাটি ক'রে পিছন দিকে ওলটানো, একগাছিও অগোছালো নেই ; পায়ে চকচকে মশমশে ব্রাউন জুতো, গাড়ি থেকে নামল। সঙ্গে দুটি মেয়ে। তোমার মুখে আগুন। ( আগুনই তো, ঠোঁটের সিগারেট তো কখনও নিবতে দেখিনে। )

ওরই পিছে-পিছে ঘরে ঢুকল মেয়ে দুটি। খুট-খুট-খুট-খুট— জুতোর উঁচু গোড়ালিটা যেন ওদের দেমাকের মাপে অর্ডার দিয়ে তৈরি ক'রে নিয়েছে। পাউডারের গুঁড়ো-ছড়ানো মুখের রং কটকটে ; নখ আর ঠোঁট টকটকে। নির্ঘাত এইমাত্র কারও বুক চিরে রক্ত খেয়ে উঠে এল।

তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, দেখতে তো কিছু পেলুম না, কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে ছুটোছুটি লুটোপুটি আর খিলখিল হাসি শুনলুম। যেন হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে ও-ঘরের জমাট ধুলো ধুইয়ে দেবে। মাঝে-মাঝে দুপদাপ শব্দ শুনি ; আসবাব টানাটানি ক'রে তছনছ করছে। তুমি একলা পুরুষমানুষ, দু-দুটো বয়সের মেয়েকে ভর-সন্ধ্যায় ডেকে এনে তোমার এত হাসাহাসি কিসের। তারপর এক ঘণ্টার বেশি হ'য়ে গেল,

ওদের আর সাড়া পাইনে। আজ কি ওরা তবে যাবে না? রাতটা ওখানেই কাটাবে? একটি পুরুষ আর দুটি মেয়ে? সর্বনাশ।

খানিক বাদে লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখলুম। সিগারেট কিনল —বোধ হয় দু-তিন প্যাকেট। দোকানীকে একটা দশ টাকার নোট দিল। ভাঙানি না গুনেই রাখল পকেটে।

এবার খানিকটা এগিয়ে দাঁড়াল খাবারের দোকানের সামনে, ঠোঙা ভ'রে মিষ্টি কিনল, টাকা দিল— এবারও দশ টাকার নোট।

কথায়-কথায় নোট ছড়াও— তোমার মতলব আমি বুঝে নিয়েছি। টাকা ভাঙিয়ে খুচরো ক'রে রাখতে চাও। কে জানে, এত নোট তোমার আসে কোথা থেকে। কাল যদি সকালে পুলিশ এসে হানা দেয়, তোমার বাসায় খুঁজে পায় নোট জাল করার যন্ত্রপাতি, তবু অবাক হব না। তুমি সব পারো, এই নিরীহ গলিতে শনি হ'য়ে ঢুকেছ; আর ওইরকম ফাঁকা বাড়িতেই তো তোমাদের কাজকর্মের সুবিধে।

তবু ভালো, রাত নিষুতি হবার আগেই মেয়ে দুটিকে বিদায় দিলে। কেলেঙ্কারিটা পুরো না ক'রে আমাকে বাঁচালে।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আর চারজন পুরুষমানুষকে ডেকে আনলে কেন। ওরা কারা। সকলের হাতেই ছোটো-ছোটো প্যাকেট, ওগুলো কিসের। মনে হচ্ছে যেন জামা-কাপড়? ওর মধ্যে আবার সোনারুপো, আফিম-টাফিম নেই তো। নোট জাল করো তা তো জানি, তুমি আবার পাকিস্থানে গোপনে মাল চালান দাও নাকি। আর সেইজন্যেই এখানে, শহরের এই অন্দরের গলিতে ঘাঁটি করেছ? কাল সকালে স্বামীকে সব ব'লে আমি যদি পুলিশ ডাকি? যদি তোমাকে ধরিয়ে দিই?

তোমার ঘরে আলো জলল, কনেকশন পেয়ে গেছ দেখছি। একটা চৌকিও এনেছ। টেবিল আর আলমারিটা কবে যোগাড় করলে, টের

পাইনি তো। চৌকিটায় বিছিয়ে দিলে একটা পাটি, দু-প্যাক তাস খুলে ছড়িয়ে দিলে। মাঝে-মাঝে কথা কাটাকাটি, আর পয়সার ঝনঝন শুনি। এইজন্যেই কি দু-দুটো দশ টাকার নোট ভাঙিয়েছ, বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে জুয়া খেলবে ব'লে? কোনো বিদ্যেই দেখছি তোমার অজানা নেই। তা গোটা কয়েক গ্লাস আর একটা বোতল খুলে নিয়ে বসলে না কেন, তা হ'লেই সোনায় সোহাগা হ'ত।

সেই থেকে জ্বলছি। ওরা কখন গেল, রাত্রে না ভোরে, জানি না। কিন্তু আজ সকালে, নির্লজ্জ অসভ্য লোকটা, হাসল কেন আমার দিকে চেয়ে, কেন অপমান করল। এখন ওকে আমি জব্দ করি কী ক'রে।

তখনও জানতুম না, আমাকেই আরও জব্দ করবার ও ফন্দি আঁটছে। জানলার শিক ধ'রে ফুঁসছি, তখনই আমার ছেলে দুটি ঘরে এল, দু-জনের হাতেই একমুঠো ক'রে টফি।

'কোথায় পেলি, কোথায় পেলি এসব।' ওদের ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। টফি সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল, কাঁদো-কাঁদো মুখ করল দু-জন। ইশারায় ও-বাড়ির জানলা দেখিয়ে দিল।

'কেন নিয়েছিস, কেন নিয়েছিস, ওর দেওয়া জিনিস হাত পেতে। চাইতে গিয়েছিলি?'

'না, ডেকে দিল।'

'আর কী করল, বল। টফি দিল, দিয়ে কী বলল তোদের। বলতেই হবে।'

'কিছু বলেনি মা। শুধু আদর করেছে।'

'আর?'

'বলেছে, মাঝে-মাঝে এসো তোমরা, আমি ছেলেপুলেদের খুব ভালোবাসি। আর—'

রুদ্ধশ্বাসে বললুম, 'আর কী।'

'আর, বলেছে, তোমাদের নামে সুন্দর ক'রে দুটো ছড়া বানিয়ে রাখব। তোমরা এসে শিখে নিয়ো, কেমন?'

ছড়া? লোকটা ছড়া বানাতেও জানে? ও কি তবে কবি। আমার উত্তেজনা ক'মে এসেছিল, মুহূর্তে লোকটার লম্বা এলোমেলো চুল, বড়ো-বড়ো চোখের উদাস দৃষ্টি, খাপছাড়া স্বভাব— সব-কিছুর যেন আলাদা মানে দেখতে পেলুম। তাই কি ও জানলার পাশে ব'সে থাকে, লেখে, সিগারেট ধরায়, লেখে, থেকে-থেকে গুনগুন ক'রে গান গেয়ে ওঠে? আশ্চর্য, আমাদের চেনা কিছুর সঙ্গে না মিললেই আমরা মানুষকে কত ভুল বুঝি!

ফিসফিস ক'রে ছেলেদের বললুম, 'আর, আমার কথা কিছু বলল না রে?'

'কই মা, না তো!'

'কিচ্ছু না, একেবারে কিচ্ছু না?' জোরে, এক নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলে নিজেই লজ্জা পেলুম। কী ক'রেই বা বলবে। রুচিসম্পন্ন শিল্পী মানুষ, সে কি না-আলাপী পরের বউ সম্পর্কে অশোভন কৌতূহল দেখাতে পারে।

তবু তো ভয় পেলুম। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, বাড়িতে কেউ নেই, দরজা খুলে দিয়েই পিছিয়ে এলুম।

এমন বীভৎস রূপ কোনো মানুষের দেখিনি। চোয়াল চুইয়ে রক্ত পড়ছে, একটা হাত দিয়ে গাল চেপে ধরেছে, রক্ত পড়ছে কনুই গড়িয়েও। শার্টের বুকের কাছটায় ছোপ-ছোপ লাল লেগেছে।

ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, 'ডেটল আছে আপনার বাড়িতে, কিংবা আয়োডিন? এই দেখুন কেটে ফেলেছি— দাড়ি কামাতে গিয়ে—'

ওর গলা কাঁপছিল। তখনও রক্ত চুইয়ে পড়ছে, থামছে না। যে-হাত দিয়ে ক্ষতটা চেপে ধরেছিল সেটা দিয়েই চুল সরাতে গেল, কপালের কাছেও লেগে গেল খানিকটা রক্ত।

আর ঠিক তখনই আমি ভয় পেলুম।

'না, না, কিছুই নেই,' ব'লে উঠলুম প্রায় চেঁচিয়ে, 'আপনি যান— যান এক্ষুনি।' ওর মুখের উপরেই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলুম।

তারপর কাঁপতে-কাঁপতে উঠে এসেছি উপরে। গালে হাত চেপে লোকটা রাস্তা পার হ'য়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে। ওর কপালের দাগটা কি সেই জলে ধুয়ে গেল। ঘরে ঢুকে লোকটা ছটফট করতে থাকল, একবার বিছানায় পড়ল লুটিয়ে, একবার উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াল। মুখ ফ্যাকাশে, রক্ত পড়ছে দরদর ধারে, ও নিজেও বুঝি ভয় পেয়েছে। খুলে ফেলেছে একটা কৌটো, চাপ-চাপ স্নো ঠেসে-ঠেসে বন্ধ করতে চাইছে রক্তস্রোত। ওকে কী করুণ, অসহায় আর সুন্দর দেখাচ্ছে, কী বলব।

তখনই গভীর মায়া আর মমতা বোধ করলুম। ধিক্কার এল নিজের উপরে। কেন ওকে ফিরিয়ে দিলুম এভাবে, কেন আহত মানুষটার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। ডেটল, আয়োডিন আমার বাসায় তো সবই ছিল।

টেবিলের উপরে মাথা হেলিয়ে লোকটা নেতিয়ে আছে। জানি না, রক্ত-পড়া থেমেছে কিনা। যদি না থামে, যদি ফোঁটা-ফোঁটা ক'রে সব রক্ত বেরিয়ে যায়? ও কি তখনও ওইভাবেই প'ড়ে থাকবে, এখন টেবিলের উপর মাথা রেখে যেমন আছে? কোনো সাড়া থাকবে না, হয়তো ও ম'রেই যাবে।

ম'রে যাবে, কিন্তু কেউ জানবে না। যদি এই বিচিত্র মানুষটার বন্ধুদের কেউ কোনোদিন ফিরে আসে, দরজা ঠেলে সাহস ক'রে ঘরে ঢোকে, তবেই নির্জন এই বাড়িতে গোপন একটি মৃত্যুর খবর পাবে। তার আগে নয়।

আর, সেই মৃত্যুর কারণ হব আমি।

তিরস্কার করলুম নিজেকে। আর আশ্চর্য, তিরস্কার করলুম ওকেও। একা-একা একটা নিঃসঙ্গ ঘরে বাস ক'রে নিজের অপঘাত মৃত্যু যে নিজে ডেকে এনেছে। কেন ও এমন রহস্যময়, কেন ও এত অস্থির, কেন সাবধানে সব কাজ করে না, শতকরা নিরেনব্বই জন মানুষ যা, ও কেন তা নয়। এমন অগোছালো, অসহায়, অসাবধান যদি, তবে কেন ও নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকে না। তারা অন্তত দেখাশোনাটা করতে পারত। এতখানি বয়স পর্যন্ত কাউকে কি ও আপন করতে পারেনি।

সৃষ্টিছাড়া মানুষটা তবে এই গলিতেই মরতে এল কেন।

মরেনি, তবে লোকটা দিন চারেকের জন্যে উধাও হয়েছিল।

মাল-বোঝাই লরি ও-বাসার সমুখে এসে দাঁড়াতে, তাড়াতাড়ি বারান্দায় এলুম।

সেই লোকটাই। হাফ-শার্ট আর পাজামা পরনে, কুলিদের হুকুম দিয়ে-দিয়ে সব জিনিস ঘরে তুলে ফেললে। একটা ট্যাক্সি থেকে একটু আগেই নেমে গিয়েছে একটি বউ, মাঝবয়সী না তরুণী তখন দেখতে পাইনি, কোলে কাঁথায় জড়ানো একটা বাচ্চা, আর পিছনে-পিছনে এক পাল ছেলেমেয়ে। গুনে দেখিনি, তবে অন্তত চার-পাঁচজন হবে।

লোকটা এতদিনে তবে ওর বউ নিয়ে এল।

সারাদিন ওদের আর দেখতে পেলুম না। আভাসে বুঝলুম, ধোয়া-মোছা ঘর-সাজাবার পালা চলছে।

বউটির সঙ্গে আলাপ হ'ল বিকালের দিকে। গা ধুয়ে, টিপ প'রে জানলার কাছে এসেছে, চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসল।

দোহারা চেহারা, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, মুখে শ্রী আছে, তবে অপরূপ কিছু নয়।

বললুম, একটা কথা দিয়ে শুরু করতে হয় তাই জানা আছে, তবু বললুম, 'আজই এলেন বুঝি ?'

ঘাড় কাৎ ক'রে মিষ্টি হেসে বউটি বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বাড়িটা তো ভাড়া নেওয়া হয়েছে মাসখানেকের ওপর ?'

'হ্যাঁ, ভাই। উনি হঠাৎ বদলি হ'য়ে চ'লে এলেন। এসেই বাসাটার খোঁজ পেলেন, হাত-ছাড়া করেননি। আমার তো আসবার উপায় ছিল না, দেখছেন না ?'

দোলনায় শোয়ানো বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বউটি আবার বলল, 'বাপের বাড়িতে ছিলুম। শরীরটা একটু সেরে উঠতে এখানে এলুম।'

আমি বললুম, 'ও।'

বাচ্চা হবে ব'লে বউ আসতে পারছিল না, বাড়িটা তাই এতদিন ফাঁকা প'ড়ে ছিল ?

দিব্যি হাসিখুশি, বউটি কথা বলতে পেলে সহজে ছাড়ে না। আমিও কথা বলছিলুম, দেখি, সেই দুটি মেয়ে ঘরে ঢুকছে। একদিন যারা সন্ধ্যা-বেলা এসেছিল।

আমি প্রমাদ গুনলুম। ওরা একেবারে দিন বুঝে এসেছে। হাতেনাতে ধরা প'ড়ে যাবে যে।

বউটি বললে, 'আমার ভাসুরঝি। দুটিই এখানে হসটেলে থেকে

কলেজে পড়ে।' ফিরে ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোরা একদিন এসে ওর ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলি, না ? চিঠিতে খবর পেয়েছি।'

তখনই ওর স্বামী ঘরে ঢুকলেন। মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টেনে বউটি স'রে দাঁড়াল।

স'রে এলুম আমিও।

অনেক খবরই আমি গল্পে-গল্পে জেনে নিয়েছি। ভদ্রলোক কাজ করেন। রেল না প্লেন কোম্পানি, কী বলল যেন। কোনোদিন দিনে ডিউটি, কোনোদিন রাত্রে। রাত্রে কাজ পড়লে দিনে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমন। আবার টুরও আছে। ওঁকে মাঝে-মাঝে বাইরেও যেতে হয়। বেশ কয়েক-দিনের জন্যে বাড়িতে ওঁর টিকিটির দেখা মেলে না।

পরদিন সকালে ভদ্রলোক শাকসবজি-ভর্তি থলে হাতে ঝুলিয়ে বাজার থেকে ফিরলেন, আমার স্বামীর পিছে-পিছেই। একটুও রহস্য নেই, একেবারে পরিষ্কার দেখতে পেলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ধুতি আর পাঞ্জাবি প'রে আবার বেরুলেন, অফিসে যাবেন। চৌকাঠে দাঁড়িয়েই একটি পান পুরলেন মুখে।

ফিরে এলেন ছ'টায়। ছেলেমেয়েরা মেঝেয় মাদুর পেতে গোল হ'য়ে বসল, চা এল, চুমুক দিতে-দিতে উনি ওদের ধমক দিলেন। বুঝলুম, পড়া-শোনার খবর নিচ্ছেন।

আমার আর ভয় নেই, ভাবনা নেই।

জানি, পরদিন সকালে রোদ্দুর যেই এসে পড়বে উনি রকে এসে বসবেন ; কোলের বাচ্চাটাকে শুইয়ে ড'লে-ড'লে তেল মাখাবেন।

তারপর, একদিন বউয়ের সঙ্গে সংসারী খরচ নিয়ে খিটিমিটি করছেন, তাও হয়তো শুনতে পাব।

## নেপথ্য

মল্লিকার মুখখানা আলগোছে তুলে ধ'রে নয়নমোহন বলল, 'তোমার ভয় করছে না?'

মল্লিকা মুখে নয়, জোরে-জোরে মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

'অতসী যদি এসে পড়ে?'

'আসবে না, আমি জানি।' মল্লিকা বলল, খুব মৃদু গলায়, নেহাৎ ওর মুখখানা নয়নমোহনের কানের খুব কাছে ছিল, তাই কথাটা সে শুনতে পেল।

নয়নমোহন হাসল মনে-মনে। মেয়েটার সাহস আছে, তারিফ করতেই হয়। সাহসের চেয়েও বড়ো কথা, বুদ্ধি আছে ঘটে। সহজাত বুদ্ধি। একেবারে দেখে-শুনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে উপরে এসেছে।

মল্লিকা দাঁড়িয়েই ছিল। নয়নমোহন ওকে এরই মধ্যে বার কয়েক ইঙ্গিত করেছে বসতে, সোফাটাতে, ওর ঠিক পাশে, মল্লিকা বসেনি, ওর নিজেরই ব্লাউজের হাতায় সুতো দিয়ে আঁকা প্রজাপতিটার পাখা নখ দিয়ে খুঁটে-খুঁটে দেখছিল, প্রজাপতিটা ব্যথা পেয়ে ওড়ে কিনা। উড়ল না, রং পাকা। এক-একবার চাইছিল দরজার দিকে, একটু ত্রস্ত, একটু ভীত ভঙ্গি, অতসী যদি এসে পড়ে?

আসবে না, জানে, দেখেই এসেছে সে এখন রান্নাঘরে, উনুনের পাশে ঘেমে জল হচ্ছে, তবু যদি—

স্ত্রী এবং রাজকুলের মতো এই যদিটাকেও বিশ্বাস নেই।

নয়নমোহনও লক্ষ্য করছিল, মল্লিকা ভয় পেয়েছে, ঘামছে, সবুজ,

চিকন, নতুন পাতার মতো কাঁপছে। তবে নতুন পাতা কাঁপে হাওয়ায়, খুশিতে। মল্লিকা ভয়ে কাঁপছে।

এই ভয়ের উৎস কী, নয়নমোহন মনে-মনে ভাবল। এর শিকড় বোধ হয় অন্যায়-বোধে। এই যে-মেয়েটিকে আমি এখন ছুঁয়ে আছি, যে-মেয়েটি নিজে থেকেই আমার কাছে ধরা দিয়েছে, ধরা দেবে ব'লেই এসেছে, উঠেছে সিঁড়ি বেয়ে, আসবার সময় রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে অতসী সেখানে আছে কিনা দেখেই সোজা ওপরে উঠে আমার কাছে এসেছে, সে না এসে পারেনি ব'লেই এসেছে। এসেছে ভালো লাগে ব'লেই। আমারও ভালো লাগে, তাই আমি ওকে ছুঁয়েছি, এখনও ছুঁয়ে আছি। বিচার করিনি, কাজটা হিত না গর্হিত। সরু একটুখানি ভালো লাগার সুতোয় এ ওকে বেঁধে রেখেছি।

বিচার করিনি, কিন্তু মনে-মনে জানি, দু-জনই জানি, এই ভালো লাগা ভালো না, এই ছোঁয়াছুঁয়ি ঠিক না, যারা পরকে ঠকিয়ে পয়সা করে, আমরাও তেমনি একজনকে ঠকিয়েই এই সুখটুকু আহরণ করছি। কাজটা চুরি, চুরি, চুরি।

এই দোষ-সচেতনতাই আমাকে দুর্বল করেছে, ওকে করেছে ভীরু।

যতক্ষণ মনে-মনে এতগুলো কথা আউড়ে গেল নয়নমোহন, ততক্ষণ মল্লিকার একখানি হাত ওর হাতে ধরাই ছিল, মাথার ওপরে সমানে পাখা ঘুরছিল, রাস্তায় ফেরিওয়ালার হাঁকের বিরাম ছিল না।

এই ভাবনাটাই ভয়, এরই আরেক নাম অস্বস্তি। এটাকে যদি দূর না করতে পারি, তবে এই চমৎকার বিকেলটাই মাটি হবে। যে-ইচ্ছাটাকে স্পর্শ-মোহের পাত্রে তপ্ত ক'রে তুলেছি, সেটা জুড়িয়ে যাবে। মনে-মনে নিজেকে তিরস্কার করল নয়নমোহন। —এই ভাবনাটাকে, অন্তত এখনকার মতো সরিয়ে দিতে হবে।

'বোসো, বোসোই না!' নয়নমোহন বলল আস্তে-আস্তে।

মল্লিকা আড়চোখে চাইল দরজার দিকে।

'না, আজ না। এখন না।'

নয়নমোহন জানে, কথাটার কোনোই মানে নেই। আজ নয় মানে কালও নয়, কোনো দিনই নয়। কেননা অতসী আছে, অতসী তো থাকবেই। তার মন্ত্রপূত অধিকার নিয়ে। শাখা আর সিঁদুরের বলে বলীয়ান হ'য়ে। রান্নাঘরে তার সারা বিকেল-সন্ধ্যা কাটবে, মাঝে-মাঝে আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে হাসিমুখে হয়তো এসে দাঁড়াবে। হাতে সম্ভবত কিছু খাবার। সাপ্তাহিকের পাতা থেকে নতুন কোনো রান্নার ফরমুলা শিখে নিয়েছে। নয়নমোহনকে চাখতে বলবে।

রাগ করা চলে না। কেননা এও একরকমের ভালোবাসা, মাতৃত্বের রসে ভেজানো, কিন্তু তাতে ঠিক মন ভরে না। ওপরের ফ্ল্যাটের যে-মেয়েটি আগে আসত ছুতো পেলেই, কারণে-অকারণে, নয়নমোহনের টেবিলের কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করত, নয়নমোহনের যে-ছবিটা দেয়ালে টাঙানো আছে সেটাকে দেখত বারবার, ওর অফিসে যাবার সময়টিতে জানলায় দাঁড়াত, সেই ভীরু, কৃশ কিশোরীর মন বুঝতে তো বাকি ছিল না? একদিন নয়নমোহন হাত বাড়িয়ে ওর আঁচল টানল, ও ধরা দিলও। তিতির পাখির মতো ওর ছোট্টো বুক কাঁপছিল। তারপর খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পাখি যেমন পালায়, হঠাৎ তেমনি পালিয়ে গেল।

সেদিনের পর সেই শ্যামলা, কোমলা আরও কতবার এসেছে, সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, নয়নমোহনের ঘরখানাকে বিদ্যুচ্চমকে উদ্ভাসিত ক'রেই মিলিয়ে গিয়েছে। তাকে শুধু ছোঁয়া গিয়েছে, পাওয়া হয়নি।

নয়নমোহন জানে, হবেও না। যতবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা

যাবে অতসীর, ততবার ওরা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে স'রে দাঁড়াবে। দু-একটি বাজে কথা বলা হ'লে মল্লিকা বিদায় নেবে।

হয় অতসী আছে, নয়তো অতসী যখন-তখন এসে পড়তে পারে, এই ভয় আছে।

অতসীর উপস্থিতিটাই একটা কড়া পাহারা।

নয়নমোহন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ যেন, সেই সে-কালের মতো, দেবতা দেখা দিয়ে বর দিলেন : 'বৎস, তুমি যা চাও, তাই হবে।'

অতসী বাক্স গোছাচ্ছিল, আর বলছিল, 'তুমি যেন কেমন-কেমন। মোটে তো পনেরো দিনের ব্যাপার। কাকা পাস পেয়েছেন, আমাকে সঙ্গে নিতে চাইছেন। দেখবে, দেখতে-দেখতে ক'টা দিন কেটে যাবে। তুমি তো আগেই সব ঘুরে এসেছ, এবার আমি বিনা খরচায় বেড়াবার সুযোগ পেয়েছি, যাব না?'

'বেশ, যাও।' ব'লেই নয়নমোহন নিজেকে ধমক দিয়ে মনে-মনে বলল, 'সাবধান, সাবধান। একটুও আহ্লাদের ভাব যেন না ফোটে মুখে, অতসী কিছু যেন টের না পায়। বিষণ্ণ একটা মুখোশ এঁটে রাখো মুখে, বারবার ওকে বলো, তুমি যেয়ো না। আমার খুব কষ্ট হবে।'

নয়নমোহন তাই করল। বলল, 'তুমি চ'লে গেলে, অতসী, আমার খুব কষ্ট হবে।'

অতসীর ফরসা, সুখী, ভরা-ভরা মুখ হাসিতে ভ'রে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল, 'আহা।' আরও কী বুঝি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ টের পেল, মল্লিকাও এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'শুনেছ মল্লিকা, তোমার দাদার কথা। দু-চার দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। উনি তাতেই

একেবারে আকুল হয়েছেন! আমরা যেন এখনও ছেলেমানুষটি আছি, আমাদের যেন কাল বিয়ে হয়েছে।'

অতসী সুখে ঘামছিল, আঁচল দিয়ে সিঁদুরের ফোঁটার ছড়ানো অংশটা মুছে ফেলল। আবার বলল, 'সেই থেকে কাঁদো-কাঁদো মুখ ক'রে ব'সে আছেন। ছেলেমানুষের মতো আমার পিছন-পিছন ঘুরছেন। খালি বলছেন, তুমি গেলে আমার কী হবে। আমি বলছি, কী আবার হবে। বাইরে খাবে, কিংবা তোমার দাদার ওখানে। ক'টা দিন বৈ তো নয়। আর, সকালে সন্ধ্যায় দু-পেয়ালা চা মল্লিকাই তোমাকে ক'রে খাওয়াতে পারবে। কী মল্লিকা, পারবে না?'

মল্লিকা আস্তে-আস্তে বলল, 'পারব বউদি।'

অতসী আবার হাসল। '—ওই দেখ। পারবে। বাস, আর কোনো ভাবনাই রইল না। এবার পথ ছাড়ো দিকি। আমি কাপড়টা বদলে তৈরি হ'য়ে নিই। কাকা এসে পড়লেন ব'লে।'

তৈরি হ'তে আড়ালে গেল অতসী, তখন নয়নমোহন মল্লিকার দিকে তাকাল। মল্লিকাও আয়ত দুটি বড়ো-বড়ো চোখ মেলে চেয়ে আছে। ওরা একটিও কথা বলল না। বলবার প্রয়োজন ছিল না। বলবার মতো কথাই ছিল না।

ফিরে এসে রিং থেকে একটি চাবি নয়নমোহনের হাতে দিয়ে অতসী বলল, 'এটা বাক্সের।' আরেকটা দিল মল্লিকাকে। 'এটা ঘরের। তোমার কাছে রাখো ভাই। বিকেলে ঝি আসবে ঘর ঝাঁট দিতে, তখন খুলে দিয়ো। তোমার দাদা তখন তো থাকবেন না।'

একটিও কথা না ব'লে মল্লিকা চাবিটা নিল। আবার নয়নমোহনের সঙ্গে ওর দৃষ্টিবিনিময় হ'ল, খানিকটা বিব্রত যেন দু-জনেই, খানিকটা যেন হতবুদ্ধি।

একটু পরে অতসীর কাকা এলেন, ব্যস্ত মানুষ, বসলেন না, নিচে ট্যাক্সি দাঁড় করানো আছে, তাড়া দিয়ে বললেন, 'চল, চল।' নিজেই অতসীর স্যুটকেসটা হাতে ক'রে নেমে গেলেন।

সিঁড়ি যেখানে ঘুরে গিয়েছে, সেই জায়গাটায় একটু আড়াল, অতসী মাথা নিচু ক'রে প্রণাম করল নয়নমোহনকে। আর সেই প্রণামে নয়নমোহন অত্যন্ত সংকুচিত, অত্যন্ত অভিভূত হ'য়ে পড়ল। সেই সংকোচ, সেই অভিভব চাপা দিতেই যেন হঠাৎ ব'লে উঠল, 'তোমার ভয় করছে না?'

'ভয়? কিসের ভয়?' অতসী বলল সহজ গলায়। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছে। জ্বলছে ওর শাড়ির গাঢ়-লাল রঙের পাড়। বলল, 'ভয় কিসের।'

কিসের, সেটা বুঝিয়ে বলতে পারল না নয়নমোহন, ঢোঁক গিলল। তবু, একটি প্রণামে ওর মনে যে-গ্লানিবোধ সঞ্চারিত হ'য়ে গিয়েছে যেন তারই অদৃশ্য নির্দেশে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'আমাকে— মানে মল্লিকাকে, আমাদের দু-জনকে নিয়ে তোমার কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই?'

অতসী দুটি চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে কথাটা শুনল। যেন মানে বোঝেনি। একবার মুখে ছায়া পড়ল, একবার যেন উবে গেল সবটুকু রক্ত মুখের। তারপরে ধীরে-ধীরে সেই গোল, ভরা-ভরা মুখে হাসি ফুটে উঠল, নয়নমোহন দেখতে পেল। অতসীকে বলতে শুনল, 'তুমি ঠাট্টা করছ। আমাকে ধ'রে রাখতে মিছিমিছি সব বাজে ভয় দেখাচ্ছ। আমি এত নীচ নাকি, তোমাকে এতদিন ধ'রে দেখছি, এটুকু বিশ্বাস আমার আছে। বুঝলে মশাই? এবার নামো তো। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।'

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মল্লিকাও প্রতিটি কথা শুনতে পেল।

.. .. ..

নয়নমোহন নিজের ওপরই বিরক্ত হ'য়ে উঠছিল। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ছুঁড়ে ফেলছিল। একবার জলন্ত টুকরোটা ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ ঠেসে ধরল দেয়ালে, একটা সবুজ টিপের মতো ছোটো পোকা পলকে ছাই হ'য়ে গেল, দেয়ালে একটা ঘষা-ঘষা, ছাইয়ের দাগ শুধু র'য়ে গেল— পোকাটার চিতার চিহ্ন।

এ কী হয়েছে আমার, নয়নমোহন ভাবনার আয়নায় নিজেকে দেখতে-দেখতে বলল, এরকম করছি কেন। ট্যাক্সি চ'লে গিয়েছে কখন, অতসী এখন দূরে, অনেক দূরে। আমি ওপরে উঠে এসেছি। মল্লিকা, স্নিগ্ধ, শ্যামল ছিপছিপে মেয়েটি ওই তো ব'সে আছে ওখানে, ওই সোফাটাতে, দু-হাতে চোখ ঢেকে, তো আমি কেন এগিয়ে যাচ্ছি না।

মল্লিকাও তাই ভাবছিল। সোফাতে ব'সে মুখে হাতচাপা দিয়ে। মাঝে-মাঝে আড়চোখে চেয়ে-চেয়ে। একটা মৃদু আলো জ্বলছিল। ফুল-দানিতে রাখা হেনার গুচ্ছ এখনও শুকিয়ে যায়নি। মল্লিকা কাঁপছিল। শুধু দু-জনকে দিয়ে ভ'রে ওঠা যে-ক্ষণটিকে আমরা কামনা করেছি, তা তো এসেছে। আজ আর কোনো পাহারা নেই। কেউ এসে পড়বে না। তবু কেন দূরে দাঁড়িয়ে আছে ও, কেন একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করছে, দেয়ালের পোকা টিপে মারছে, কেন আমাকে স্পর্শ করছে না।

নয়নমোহনও ভাবছিল, কেন, কেন। কেন আমি এমন অসাড়, পক্ষাহত হ'য়ে পড়ছি, কোথায় অন্ধকারে একটা বেড়াল ককিয়ে উঠল তাতে ভয় পাচ্ছি কেন, কেন ঘামছি একটু-একটু ক'রে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, জল ভ'রে খেতে গিয়ে কেন গ্লাসটা ফেলে দিয়ে ভাঙলুম।

রাত বাড়ছে, একটু-একটু ক'রে যেন জোয়ারের জল বাড়ছে, মল্লিকার মনে হ'ল, আমার কোমর ছাপিয়ে সেই কালো জল বুক অবধি উঠে এল, গলা পর্যন্তও উঠবে, আমি জানি। আমি তলিয়ে যাব, ডুবে মরব। তবু

কেন ব'সে আছি, মরণকে নিশ্চিত জেনেও? কিসের ভরসায়। যদি মরি, নয়নমোহন কি আমাকে বাঁচাতে আসবে? না। ও যদি বাঁচাত, তবে তো এগিয়েই আসত, নিবিড় ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধরত, ছুঁত।

নয়নমোহন দেখল, মল্লিকা উঠছে। একটু ভয় পেল। ও নিজে থেকেই এখানে আসবে নাকি, ওর মুখ বিবর্ণ, আতঙ্কে ও আমাকেই জড়িয়ে ধরবে নাকি? নয়নমোহন ছু-পা পিছিয়ে গেল।

না, মল্লিকা দরজার দিকে যাচ্ছে। গায়ে ভালো ক'রে জড়িয়ে নিয়েছে আঁচল, ভঙ্গিতে বা দেহের কোথাও একটুও বেহায়াপনা নেই।

ও চ'লে যাচ্ছে। এবার, এখনও কি আমি এগিয়ে যাব না, ওকে বাধা দেব না, নয়নমোহন ভাবল, কিন্তু নড়ল না, শেষ সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে তিনটে কাঠি নষ্ট করল। আমি কি এত ভীতু, এত নার্ভাস? মল্লিকা চৌকাঠের ওপারে চ'লে গিয়েছে, ওর বিনুনি-ঝোলানো মাথার ছায়াটুকু মাত্র এখনও প'ড়ে আছে এ-ঘরে। দরজায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অস্ফুট গলায় ও কী যেন ব'লে গেল, আমি ভালো ক'রে শুনতে পেলাম না। ও কি ব'লে গেল, ওর রুগ্ন বাবাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আবার ফিরে আসছে? হয়তো তাই।

হয়তো তাই, তবু নয়নমোহন মনে-মনে হাসল। সে নির্ভুলভাবে জেনেছে মল্লিকা ফিরবে না। ঘরে নয়নমোহন ছাড়া আর কেউ নেই, তবু আসবে না। আসতে ওর পা সরবে না।

কেননা, ও-ঘরে সত্যিই তো নয়নমোহন একা নয়। ফরসা কপালে বড়ো ক'রে সিঁছুরের ফোঁটা যে পরে, সে নেই, কিন্তু তার অটল বিশ্বাসটুকুকে রেখে গেছে ওদের ছু-জনকে পাহারা দিতে।

তৃতীয় একজনের উপস্থিতিতে ওরা পরস্পরকে ছোঁবে কী ক'রে।

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

# হয় না

না, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ো না, ফুলটা তবে চাপা প'ড়ে যাবে। ঘাড়টা একটু এলিয়ে দাও, বেশি না একটু-ই। এইবার দেখা যাচ্ছে। সবটা না, সবটা দেখা গেলে ভালোও দেখাত না, কয়েকটি পাপড়িই যথেষ্ট। গোটা ফুল নয়, ফুলের আভাস। কিন্তু এভাবেই বা কতক্ষণ থাকা যাবে? খানিক পরে ঘাড়ের গোড়া টনটন করবে।

পাশের বাড়ির বাগান থেকে প্রকাণ্ড একটা গন্ধরাজ সংগ্রহ করেছিল আরতি। আয়না হাতে নিয়ে ভিতরের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজেকে পরীক্ষা করছিল, আর বলছিল।

একবার বলল, দূর, দূর, সুবিধের হয়নি। শাদা ফুলে আবার চেহারা খোলে নাকি। এর চেয়ে লাল একটা ফুল পেলে বেশ হ'ত! খুলত। কিন্তু ওর চোখে না। কী যে পছন্দ বাবুর, চড়া রং দু-চোখে দেখতে পারে না। টকটকে লাল কিছু দেখলে যেন খেপে যায়। আর, ওর পছন্দ হবে না এই ভয়ে খয়েরি রঙের ছাপার শাড়িটা ছুঁয়েও দেখতে পেলাম না একদিন। কেনা হ'ল, বাক্সের কোণেই প'ড়ে রইল। কী মুশকিল দেখ তো, খাব আমার আপন রুচিমতো, কিন্তু পরার রুচি পরের, বিশেষ ক'রে মেয়েদের বেলায়। ওর কেমন লাগবে, ওই এক ভাবনা। ওর, ওর, ওর।

ভেংচে-ভেংচেই বলল আরতি, তবে মনে-মনে। লাল নয়, গোলাপি নয়, খয়েরি নয়, পরতে হবে কিনা এই ছাই রঙের শাড়ি। শাড়ি না ছাই। প'রে-প'রে সুতো-সুদ্ধ ফ্যাসফেঁসে হ'য়ে এসেছে। আর মোটে

দু-খোপ, তারপরেই ওটাকে বিদায় দেব। কিনব বাসন, কিনব কাপ-ডিশ। সেই কাপেই সরোজকে চা খাওয়াব।

ছোট্টো ক'রে একটা টিপ পরল আরতি। কপালের ঠিক মাঝখানেই হ'ল তো? কে জানে। এক হাতে আয়না, তাও আবার ঝাপসা, উঁচু ক'রে ধ'রে কত আর সাজগোজ করি। কনুইয়ের কাছটা টনটন করে। একটা বড়ো আয়না যদি থাকত, বেশ হ'ত। সেটা দেয়ালে ঝুলত, ঠিক ততটা উঁচুতে, যতটা হ'লে গলা, কি ধরো, ব্লাউজের বর্ডার শুরু হয়েছে। আরও ভালো হ'ত সেটা যদি নিচু একটা টেবিলের সঙ্গে ফিট করা থাকত।

এবার আরতি ছোট্টো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেসব আর এ-বাসায়, এই ছিট-বেড়া আর টিনের চালের ঘরে, হয় না। হ'তেও পারে, অন্য কোথাও। এই শহরেই, লেভেল ক্রসিংটার উত্তরে, কোনো একটা পরিচ্ছন্ন পাড়ায়। কী যেন নাম সেই পাড়াটার, যেখানে, সরোজ বলছিল, সে একটা দু-কামরার ফ্ল্যাট নেবে?

সুর্মাদানটা হাতে নিয়ে আরতি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে লোভটাকে মুছল। ততদিন, আর কী, ততদিন, হাত টনটন করে করুক, আয়নাটা তুলে-তুলে টিপ পরি আর সুর্মা আঁকি আর চুল বাঁধি। যাবে কোনদিন চোখে কাঠিটা বিঁধে! তখন চোখ-গেল পাখির মতো কাতরাতে হবে। সরোজ ফিরেও চাইবে না। আর, চোখ গেলে, সে চাইল কিনা, তা-ও জানব না। ভাবনারও যদি কিছু মাথা-মুণ্ডু থাকে! বরং ছাই রঙের শাড়িটাকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প'রে দেখি। উপায় তো নেই, এটাকেই পরতে হবে। আমার ভালো না লাগুক, আর কারও চোখে না ধরুক, ওর তো ধরবে। অল্প-অল্প হেসে বলবে, 'ছাই-চাপা আগুন।' কে জানে, মনের কথা বলে, না ঠাট্টা করে। দুষ্টুর মতো সর্বদাই ওর চোখ মিটমিট করে, ওকে বিশ্বাস নেই।

উঁহু, চোখ ঘুরিয়ে আয়নার ভিতরকার সখীকে আরতি বলল, অত পাউডার মেখো না, ওর চোখে ধরা প'ড়ে যাবে। আর গরমে যদি ঘেমে যাও, তবে তো কেলেঙ্কারি। সাজগোজে অবশ্য ওর আপত্তি নেই, ওটা তো মেয়েদের ধর্ম। কিন্তু বাড়াবাড়িটা বরদাস্ত করতে পারে না। প্রসাধন, ও বলে, রূপকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে নয়, রূপটাকে দেখিয়ে দেবার জন্যে। পড়ার বইয়ের দরকারী লাইনের নিচে আমরা যেমন দাগ দিই। প্রসাধন আসলে সেই দাগ-দেওয়ার কাজ।

গানের গলা নয়, কাউকে শোনাবার মতো নয়, তবে নিজের কানে মন্দ লাগে না। আরতি গুনগুন ক'রে শুনে-শেখা একটা গানের দু-লাইন গাইল। গেয়েই থামল। থাক, মা কী মনে করবে। সেই বিকেল থেকে উনুনের পাশে গিয়ে বসেছে, নিমকি ভাজছে সরোজের জন্যে। মুখটা তেতে উঠেছে। তবু আমাকে ঘেঁষতে দেয়নি। উনুনের আঁচে নাকি আমার চেহারা নষ্ট হবে। কিন্তু এটা-ওটা এগিয়ে তো দিতে পারি। মা-র উৎসাহ দেখে ভালোও লাগে, হাসিও পায়। এর মধ্যে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'সরোজ এসেছে? এখনও এল না যে? আসবে তো ঠিক? তোকে কবে বলেছে বল তো ঠিক?'

আরে, আসবে, আসবে, আসবে। মাথাব্যথা কি মা-র? নাই যদি আসবে, তবে আজ বিকেলে আকাশটা হালকা মেঘে-মেঘে এমন সুন্দর হ'ল কেন? ফুরফুরে হাওয়ায় পুকুরটার সবুজ জল কাঁপছে কেন। আসবেই।

তিন-চারটে বাস ছেড়ে তবে একটার পা-দানিতে দাঁড়াতে হয়, অফিস-টাইমে যা ভিড়। এখন তো সবে সাড়ে-পাঁচটা কি ছ'টা—সাড়ে-ছ'টার মধ্যে নিশ্চয় আসবে। এ-পাড়া থেকে যারা ওদিকে গিয়েছে, তারাও তো কেউ এখনও ফেরেনি।

ফুল-তোলা একটা ঢাকনি এনে আরতি নিচু টুলটার উপরে বিছিয়ে

দিল। বাঃ, এইবার বেশ হয়েছে। চোখের যন্ত্রণা নিয়ে, আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়েও যত্ন ক'রে ফুলগুলো তুলেছিলাম, সেই যন্ত্রণা এবার সার্থক হয়েছে। আরও অনেক ঢাকনি আর পর্দা থাকত যদি আমাদের? তবে এই ঘরের যেখানে-যেখানে এখন অভাব খোঁচা-খোঁচা চোখা-চোখা হ'য়ে আছে, চোখে বিঁধছে, সব ঢেকে-ঢুকে রাখতাম। ঢাকতাম ওই রং-ওঠা তোরঙ্গটা আর কাঁঠালকাঠের তক্তাপোশে পাতা ময়লা বিছানা।

অত ঢাকাঢাকির দরকারই বা কী। সরোজের কাছে লুকোনো তো কিচ্ছু নেই। ও তো নাড়ি-নক্ষত্র সব জানে। সেই শেয়ালদা স্টেশনে যখন পড়েছিলাম, তখন থেকে জানে। আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল, খুঁজে-খুঁজে গেল সেখানে। কে আমার ভাইকে বই-বাঁধাইয়ের কাজে ঢুকিয়ে দিল? লোকের জন্যে হাঁটাহাঁটি ক'রে এই কলোনিতে চালাঘরটা তুলে দিল কে। আমি যে প্রাইমারি ইস্কুলটায় চাকরি পেয়েছি, কার চেষ্টায়?

সরোজের। মা বলেন, অমন ছেলে হয় না। আরতি আপন মনেই একটু হাসল। কেমন ছেলে, আমি তো জানি। বড়ো মন, চওড়া বুক, সব ঠিক। লোকের ভালো করবে ব'লে ঝাঁপিয়েও পড়ে। মা শুধু ওইটুকুই দেখেছেন। রাগটুকু তো দেখেননি বাবুর। ধর্মতলার সেই চায়ের দোকানে আমার জন্যে একদিন আধ ঘণ্টা ব'সে থাকতে হয়েছিল ব'লে কী রাগ! আমি এ-কথা বলি, সে-কথা বলি, সাড়াই দেয় না। শেষে আলগোছে টেবিলের নিচে হাত দিয়ে একটা চিমটি কাটলাম। তখন হেসে ফেলল। আমাদের সিনেমা দেখার কথা ছিল। বলল, আর পাঁচ মিনিট দেরি হ'লে নাকি টিকিট দুটো ছিঁড়ে ফেলে দিত।

কেন দেরি হবে না? আমার কি গাড়ি আছে। সেই তো বাসই ভরসা। তোমরা পুরুষমানুষ, গায়ে জোর আছে, কারও ছোঁয়া লাগলে

গায়ে ফোসকা পড়ে না, তোমরাও বাসের পর বাস ছেড়ে দাও। আমরা মেয়ে হ'য়ে কী ক'রে উঠি? একটু বিবেচনা করতে হয়।

বাইরে কার জুতোর শব্দ পেয়ে আরতি বারান্দায় গেল। অন্য লোক। ফিরে এল ঘরে। আর, এই যে তুমিও আজ দেরি করছ, আমি রাগ করতে পারি না? যদি মান করি, যদি কথা না বলি?

না, না, আজ ওসব মান-টান ক'রে সময় নষ্ট কোরো না। অনেক দরকারী কথা আছে। এবার তো আমাদের বাসা হয়েছে, ভাইটাও কোনোরকমে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাদের ব্যাপারটার একটা-কিছু ঠিকঠাক করতে হবে। ও এলেই ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যাব। কোথায় যাব, ওই পুকুরটার পাড়ে? ওখানে যে আড়াল নেই। দু-জনে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলব? না, না, পাড়ার লোক দেখবে। তার চেয়ে এই বারান্দাই ভালো। মা তো রান্নাঘর ছেড়ে সহজে নড়ছে না।

মা ঘুময়নি, ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে আছে। চৌকাঠে দাঁড়িয়েই আরতি বুঝতে পারল। —সেই এতটুকু বয়স থেকে মায়ের পাশে শুয়ে আসছি তো, ওর ঘুম আমি বুঝি। ঘুমলে মা-র চেহারাই আলাদা হ'য়ে যায়। আর ওভাবে চিৎ হ'য়ে মা যে ঘুমতে পারে না, সেটা হয়তো ও নিজেও জানে না। আমি জানি। বাইশ বছর ধ'রে দেখছি কিনা। ঘুমলেই মা পাশ ফিরবে। তা ছাড়া আরও কয়েকটা লক্ষণ আছে।

জেগে আছে, আমি গিয়ে শুলেই কাছে স'রে আসবে। তারপর জেরা শুরু করবে। মা বড়ো অবুঝ। এত অবুঝ কেন, আরতি ভাবল, কেন বোঝে না আমি এখন ক্লান্ত, খু-ব ক্লান্ত? এইমাত্র সরোজের সঙ্গে ঘুরে এলাম, তা কমসে-কম মাইল খানেক তো হেঁটেছি, হোঁচটই খেলাম

দু-বার। ছাই রঙের শাড়িটার পাড় ছিঁড়ল, স্যাণ্ডালটার ষ্ট্র্যাপ খুলল। এখন কি অত-শত কথার জবাব দিতে পারি?

ছাই রঙের শাড়িটা খুলে আরতি সযত্নে ভাঁজ ক'রে রাখল। তুলে নিল সর্বদার কাপড়টা। আয়নাটা বাক্সের উপরেই আছে, কিন্তু মুখ দেখতে ইচ্ছে করল না। গরম লাগছে— বিশ্রী গরম লাগছে। এখন কলতলায় যাব, গায়ে না ঢালি, মাথায় জল ঢালব, ঠাণ্ডা হব। রান্নাঘরে গিয়ে দেখব, খাবার কিছু ঢাকা দেওয়া আছে কিনা। তখনও কি মা ঘুমবে না।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে-দিতে আরতি ভাবল, তুমি ঘুমলে কি না ঘুমলে, তাতে আমার ব'য়েই গেল। ঘুমও বা না ঘুমও, আমার মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারছ না। বলব না, তার দুটি কারণ। এক, আমি ক্লান্ত। দুই, তোমাকে আমি হতাশ করতে চাই না। সারা বিকেল আজ তুমি উনুনের তাতে ব'সে চা জলখাবার করেছ, সরোজ আমাকে নিয়ে যখন বেড়াতে গেল, তখন হয়তো আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পাঁজি খুলে লগ্ন দেখেছ।

মা, তোমার বয়সই শুধু আমার চেয়ে বেশি। মানুষের মুখ দেখে কিছু টের পাও না। সংসারের রীতিনীতি বোঝো না।

কলতলা থেকে ফিরে বারান্দায় একটা টুল পেতে বসল আরতি, তবু ঘরে ঢুকল না। ওখানে ঢুকব কি, ওখানে গরম, ওখানে হাজারো জেরা। মা তো আমার মুখ দেখে টেরই পায়নি যে, আজ সব শেষ ক'রে দিয়ে এলাম। আমি যে ভীষণ ক্লান্ত, আমার যে কান্না পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে, মা কি তার সামান্য আভাসও পেয়েছে।

পায়নি। পাবে না। আমি কিছু বলব না। অন্তত আজ না। আরতি ব'লে গেল মনে-মনে, দক্ষিণ আকাশের হলদে রঙের একটা তারাকে সাক্ষী রেখে যেন প্রতিজ্ঞা করল।

টুলেও বেশিক্ষণ বসা গেল না, মশা ভারি বিরক্ত করছে। তার চেয়ে বরং দাওয়ায় বসা যাক, পা মুড়ে। মা ওর মুখ দেখে কিছু টের পায়নি কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, কিছু একটা হয়েছে। কথা প্রথম দিকে সহজভাবেই বলতে চেষ্টা করছিল বটে, নিমকিও ভেজে ভেঙে-ভেঙে খাচ্ছিল, কিন্তু চা আধ-পেয়ালা অবধি শেষ ক'রে বাকিটা যখন খেতে ভুলে গেল, মনে করিয়ে দিলুম, তখন এক চুমুকে ঢকঢক ক'রে সবটা শরবতের মতো শেষ করল, তখনই আমার খটকা লেগেছিল। দু-একটা কথার উত্তরও যেন এলোমেলোভাবে দিল। মনে হ'ল, মন দিয়ে শোনেইনি। তখনই ওকে ডেকে নিয়ে বললাম, চলো। বেড়াতে যাই। মাকে বললাম, মা আমরা একটু ঘুরতে যাচ্ছি। মা বলল, যা, বেশি দেরি করিস না। আমি জানতাম, করলেও মা কিছু মনে করবে না।

বেড়াতে গিয়ে কী ঘটেছিল, আরতি মনে-মনে গুছিয়ে নিল। ওরা পাশাপাশি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল। তখন দু-একটা বাজে কথা বলেছে মাত্র। তারপর সেই বাগানটা পাওয়া গেল, বটগাছটার সেই বাঁধানো বেদি। একেবারে নিরিবিলি।

আরতি বলল, 'এইবার আমাকে বলো।'

সরোজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল— 'কী বলব।'

'মিছে কথা বোলো না। আমি জানি, তোমার একটা কিছু হয়েছে।'

হাই তুলেছিল সরোজ। নির্বিকার, উদাসীন ভঙ্গি, একটু বা কঠিন। 'কিছু হয়নি, আমি এখান থেকে চ'লে যাব। ঠিক ক'রে ফেলেছি।'

'কোথায় যাবে।'

'অন্তত এই বাংলাদেশের বাইরে তো বটেই। এখানে আমার আর ভালো লাগছে না।'

'কী হয়েছে।' আরতি ওর হাত ধরেছে, 'আমাকে বলো।'

'কিছু না, বলছি তো।'

'তুমি লুকোচ্ছ।'

এতক্ষণ তবু সংযত ছিল সরোজের ভঙ্গি, হঠাৎ উঠে প'ড়ে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'দেখ, আমি লুকোইনি, বরং লুকিয়েছ তুমি।'

'আমি!'

'তুমি। দেখ, আমি বলতে চাইনি। তুমি জোর করলে ব'লেই বলছি। আমার এসব কথায় রুচি ছিল না।'

'দেখ, ভনিতা রাখো। কী লুকিয়েছি আমি, কী তুমি জেনেছ, আমাকে বলতেই হবে।'

ধীর গম্ভীর স্বরে সরোজ বলল, 'লুকিয়েছ তোমার অতীত।'

'লুকিয়েছি? তুমি জানতে না, আমরা কত গরিব। জানতে না গ্রাম থেকে এসে স্টেশনেই তিন মাস ছিলাম?'

সরোজ বলেছে, 'জানতাম। শুধু জানতাম না, তুমি— তুমি আমি যা ভেবেছিলাম তা নও।'

'নই?'

'না। দেশ ছেড়ে আসবার আগে তোমাকে ওরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। দু-মাস ওদের হাতে ছিলে। শেষে কোনোমতে ছাড়া পেয়ে মা-র কাছে ফিরেছ, এখানে পালিয়ে এসেছ।'

'আর?'

'আর?' সরোজ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছে। 'না, আর কিছুই নেই।' বলতে-বলতে সে যেন অবসন্ন হ'য়ে ফের বেদিতেই ব'সে পড়ল, অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বলল, 'কেন তোমরা আরও কয়েক মাস আগে চ'লে এলে না আরতি, অনেকেই তো এসেছিল। তবে তো এই সর্বনাশ হ'ত না।'

'না।' আরতি ধীরে-ধীরে বলেছে, 'হ'ত না। সরোজ, তুমি তা হ'লে একটি পবিত্র কুমারীই পেতে।'

সরোজ যেন একটু অপ্রতিভ হয়েছে। 'তুমি ঠাট্টা করছ। তুমি জানো আমার নিজের কোনো সংস্কার নেই। কিন্তু আমার দিদি—'

'না, না, তাঁকে ঠকানো ঠিক নয়।'

'তুমি আমাকে কেবলই ভুল বুঝছ। তোমাদের গ্রামেরই একটি লোকের সঙ্গে সেদিন দিদির দেখা হয়েছিল।'

'স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তিনিই খবরটা দিলেন?'

'না, না, ঠিক সেভাবে নয়। কথায়-কথায় হঠাৎ বললেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তিনি আমাদের কথাটাও জানেন না। তুমি জানো না আরতি, সেই থেকে আমি কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি। তুমি একবার শুধু বলো, যা শুনেছি তা মিথ্যে?'

দাঁতে ঠোঁট চেপে আরতি বলেছে, 'না, মিথ্যে নয়। বর্ণে-বর্ণে সত্যি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।'

আর কোনো কথা ছিল না, আরতি দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এসেছে।

সরোজ পিছে-পিছে আসছিল, থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে চেয়ে আরতি বলেছে, 'তুমি আর এসে কী করবে। একা আমি ঠিক যেতে পারব। কিছু হবে না। আর—' আরতি এখানে জোর ক'রে একটু হেসেছে। 'আর হ'লেই বা কী। আমার ইতিহাস তো জেনেই ফেলেছ। নতুন ক'রে আমার আর কী-ই বা ক্ষতি হ'তে পারে?'

মা ঘরের মধ্যে ছটফট করছে, আরতি টের পেল। মা-র বড়ো ঔৎসুক্য, বড়ো ভয়। আরতি কেন এখনও ঘরে ঢুকছে না, কী করছে এখনও বারান্দায়? বড়ো ভয় মা-র, কারণে-অকারণে ভয়। অনেক ঘা

খেয়েছে কিনা, তাই কিছুতেই ভরসা পায় না ; খালি ভয়। একরকমের স্নায়ুরোগ, ডাক্তারেরা বলেছেন।

মাকে কিছু বলা হবে না। আরতি পা টিপে-টিপে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। খোঁপার নিচে এটা কী। আরে সেই গন্ধরাজ ফুলটা যে। ওটা এখনও খ'সে পড়েনি ? আরতি একবার ভাবলে, ওটাকে জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলি। আবার মনে হয়, থাক। ফুলই তো। কতটুকু বা পরমায়ু ওর। এমনিতেও ঝরবে, শুকোবে, অমনিতেও বাসী হবে। থাক, খোঁপাতেই থাক। থাক না ! আর এই তো শেষ ফুল-পরা, ও তো আর কোনোদিন আসবে না।

অথচ সরোজ এল, ঠিক দু-দিন পরেই, আর দুর্যোগ মাথায় ক'রে সেদিনই যে, এত সকালেই যে, আসবে, কে জানত ! শেষ-রাত থেকে বৃষ্টি হয়েছে, সকালেও খোলা নালীতে অবিরাম জলস্রোত, মেঘ কাটেনি। ঝাঁকে-ঝাঁকে বৃষ্টি আসছে। থেকে-থেকে এক দল ঘোড়সওয়ার যেন দিগন্ত থেকে দিগন্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যাচ্ছে। নিশান উড়িয়ে তাদের ধাওয়া ক'রে চ'লে যাচ্ছে অশরীরী হাওয়া।

আরতি শুয়ে-শুয়ে দেখছিল। এ হ'ল এমন দিন, যেদিন পাখিরাও আকাশকে ভয় পায়, ওড়ে না। আজ ওড়েনি। দেখছিল, রাস্তার ধারের রোগা করবী গাছটা নুয়ে প'ড়ে, যেন বুক দিয়ে আগলে, ওর বাচ্চা ফুলগুলোকে ধ'রে রাখছে।

ঠিক তখনই সরোজ এল।

আবার কেন এল ও। আজ কেন। কেন আমার সকালের আলস্যটুকু ভাঙল। এখনই উঠতে হবে, আঁচলটা ঠিক করতে হবে, শাড়িটাও বদলে—

দূর, অত কেন। সব তো শেষ হ'য়েই গিয়েছে। যেভাবে আছি

এইভাবেই যাই। দরজা খুলে আরতি বারান্দায় এল। 'ইস, একেবারে ভিজে গেছ।'

শুধু ভিজে গিয়েছে ব'লেই নয়, সরোজকে খুব অগোছালোও লাগছিল। জামাটার বোতামও ঠিকমতো পরায়নি।

আরতি বলল, 'গামছা এনে দিই, মাথা মোছো। ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে। চা করব ?'

চা করতে যাবে ব'লেই বুঝি পিছন ফিরছিল, সরোজ ওর আঁচল টেনে ধরল। গাঢ় গলায় ব'লে উঠল, 'আরতি, আমাকে ক্ষমা করো।'

'ছাড়ো। মা ও-ঘরে আছে। হঠাৎ এসে পড়তে পারে।'

সরোজ কিছু শুনল না, ওর হাত দুটি চেপে ধ'রে বলল, 'আমি ইতরের মতো ব্যবহার করেছি। ক্ষমা করো।'

আমি দুর্বল হ'য়ে পড়ছি, আরতি ভাবল। নিজের ভুলটা বুঝেছে ও, এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এসেছে, আমি কী করি। সবটুকু জোর কুড়িয়ে নিয়ে আরতি বলল, 'স্থির হ'য়ে বোসো তো। এভাবে কথা হয় না।'

টুলে বসেছে সরোজ, দু-হাতের মধ্যে মাথা রেখেছে। শুকনো, ভাঙা-ভাঙা গলায় বলছে, 'আমি এ দু-দিন ঘুমতে পারিনি।'

সতর্ক দৃষ্টিতে আরতি ভিতরের দিকে চাইল। মা আসছে না তো। এলেই বা। মা-ও তো খুশি হবে। এই দু-রাত্রি মা নিজেও তো ঘুময়নি। তবু একবার সন্তর্পণে লজ্জায় ভিতরের দিকে চেয়ে আরতি সরোজের চুলে আঙুল ঢুকিয়ে বলল, 'ওভাবে বোলো না। আমিও তো ঘুমতে পারিনি। তুমি ফিরে তো এসেছ, এই ঢের। কত ভুলই তো আমাদের হয়।'

চোখ তুলে সরোজ বলল, 'কী বিশ্রী ভুল বলো তো! তুমি সেদিন বোধ হয় খুব অভিমান করেছিলে, তাই ইচ্ছে ক'রেই আমার ভুলটা ভেঙে দাওনি। আমি কিন্তু জেনেছি।'

আরতির গলা কেঁপে গেল। 'কী জেনেছ ?'

'সেই ভদ্রলোককে দু-দিন ঘোরাঘুরি ক'রে কাল সন্ধ্যার পরে ধরেছি। খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। বিশিষ্ট ভদ্রলোক, বলেছি তো মিথ্যে বলবেন না। তিনি কয়েকটা কথার পরেই টের পেলেন, মারাত্মক রকমের ভুল করেছেন। যে-মেয়েটির কথা তিনি বলেছিলেন, তুমি সে নও। অপ্রস্তুত হ'য়ে বারবার ক্ষমা চাইলেন। আরতি, ক্ষমা চাইতে আজ সকালেই ছুটে এসেছি আমি। বলো ক্ষমা করেছ ?'

'করেছি।' আরতি বলল মৃদুস্বরে, কিন্তু কখন একটু-একটু ক'রে পিছিয়ে গিয়েছে, সে নিজেও টের পায়নি।

'মাকে ডাকো। তাঁকেও বলি, প্রণাম করি।'

আরতি বলল, 'আজ থাক। সরোজ, এবার চা আনি ?'

সেই গলায় কী ছিল, সরোজ চমকে উঠল, চাইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। নিষ্প্রভ মুখ আরতির, একটু যেন কঠিন। আড়ষ্ট স্বরে সরোজ বলল, 'তোমার কী হ'ল। তুমি কি সুখী হওনি।'

চোখ সরিয়ে আরতি জানলায় রাখল। এখনও মেঘ কাটেনি 'সরোজ, তুমি কী ক'রে ফিরবে। এখনও যে বৃষ্টি থামল না ?'

এবার অসহিষ্ণু হ'য়ে সরোজ ব'লে উঠল, 'তুমি কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ। খালি ফিরে যাবার কথা বলছ। তোমার অভিমান কি এখনও গেল না ? বলেছি তো, আবার বলছি, আমি ভুল করেছি। তোমার কোনো কলঙ্ক নেই।'

সরোজ উঠে দাঁড়াল। হয়তো আরও একবার আরতির হাত ছোঁবে ব'লে এক পা এগিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু আরতি আরও দূরে স'রে গেল, দাঁড়াল দু-ঘরের মাঝখানের চৌকাঠে। সরোজ দু-চোখ দিয়ে মিনতি করল, 'এসো।'

আস্তে-আস্তে আরতি বলল, 'তা হয় না।'

সরোজ আকুল গলায় ব'লে উঠল, 'কেন হয় না আরতি? আমার আর তো কোনো সন্দেহ নেই। সব মিথ্যে জেনেই তো আমি ছুটে এসেছি।'

তেমনই দূরে দাঁড়িয়ে আরতি খুব নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'সেই-জন্যেই তো আরও হয় না। সরোজ, তুমি সব মিথ্যে জেনেই এসেছ। সব সত্যি জেনেও তো আসতে পারোনি।'

# দুটি ঘর একটি নাটক

ওরা ভালো না। ওদিকে চেয়ো না।

চোখ বুঁজে থাকব ?

না, বরং জানলাটা বন্ধ ক'রে রেখো।

বেশ, মশাই, বেশ। যো হুকুম। কিন্তু ওরা ভালো নয় কেন ?

মানে, এই আর কি, আমাদের মতো না।

আমরা কাদের মতো ?

আমরা ? এই— আমাদের মতো।

আর ওরা ?

ওদের মতো।

আমাদের মতো যারা নয়, তারাই বুঝি খারাপ ?

লিলি, তুমি বড়ো তার্কিক হয়েছ।

কিছু জানতে চাওয়া মানেই কি তর্ক করা ? আচ্ছা, চুপ করলুম।

রাগ হ'ল ?

না, রাগ কিসের ? শুধু একটা কথা ভাবছি। এ-ঘরে জানলা তো মোটে তিনটে। একটা বরাবর বন্ধ থাকবে— ব-রা-ব-র ? হাওয়া পাব না ? আকাশ দেখব না ?

হাওয়া কি ওই একদিকেই ? পুবের জানলাটা খোলো, উত্তরেরটা খোলো, শুধু পশ্চিমেরটা খুলো না।

আচ্ছা গো, আচ্ছা। কিন্তু তুমি কি আর বাসা খুঁজে পেলে না ? এমন বাসায় আমাকে তুললে কেন, যার জানলা খুলতে মানা ?

সস্তার মধ্যে আর পেলাম না যে। তা ছাড়া এই বা মন্দ কী! খটখটে ঘর, তকতকে উঠন, কলঘর রান্নাঘর সব আলাদা। ষাট টাকায় এর চেয়ে ভালো তুমি পাচ্ছ কোথায়?

জানিনে বাপু অতশত। এসে পর্যন্ত খালি তো শুধু হুকুমই শুনছি। না হ'ল জিনিসপত্তর গোছগাছ, না ঘর সাজানো।

সাজাও না, তোমার প্রাণ যত চায়। কাল ভালো দুটো ছবি এনে দেব।

বাইরের ছবি না। এই দেয়ালে ঝুলিয়ে দেব আমাদের বিয়ের ছবিটা।

এনেছ?

কত কষ্ট ক'রে! কাগজে মুড়ে, কাপড় জড়িয়ে, যাতে কাঁচটা না ভাঙে।

সেতারটা আনোনি?

এনেছি। তুমি বাইরে গেলে একছড়া মালা কিনে আনবে কিন্তু। যেন টাটকা হয়, যেন গন্ধ থাকে। ফটোটাতে ঝুলিয়ে দেব।

আনব। সেতারটা কিন্তু সাবধানে রেখো। বরং ঘরের ওই কোণে—

ফুলগুলো কী রঙের আনবে? শাদা আর হলদে—মানে সোনালী মিশিয়ে এনো।

তোমার গলা ঠিক আছে? মনে রেখো, কাল তোমার ওস্তাদ আসবে।

মনে আছে। বাব্বাঃ, এই নিয়ে বোধ হয় চারবার বললে। ওস্তাদজীকে এই ঠিকানা দিয়েছ?

দিয়েছি।

ওঁর দাড়ি ভারি মজার, না? কেমন লালচে-লালচে। কী মেখে অমন করেছেন বলো তো?

মেহেদি। ওঁর দাড়ির দিকে না চেয়ে বরং ওঁর গলার দিকে কান রেখো।

তাই তো রাখি।

কন্‌ফারেন্সের আর কিন্তু মোটে বারো দিন বাকি।

জানি। আমার কিন্তু ভাবতেই ভয় লাগছে। কন্‌ফারেন্স-টন্‌ফারেন্স আবার কেন?

বোকার মতো কথা বোলো না। গান গাইবে, তাতে আবার ভয় কী! গাইতে তোমার ভালো লাগে না?

লাগবে না কেন? এই তো দিনরাত গুনগুন করছি। তুমি শুনছ।

আমাকে শুনিয়ে লাভ?

লাভ? কী জানি! তুমি শুনছ, ভাবতেই ভালো লাগে।

শুধু আমাকে শোনালে তো হবে না। সকলকে শোনাতে হবে।

কন্‌ফারেন্সে? আচ্ছা, ওরা হাততালি দেবে?

দেবে বৈকি।

এন্‌কোর বলবে?

বলবে।

ভারি মজা, না? হাততালি পড়লে, যা-ই বলো, আমার কেমন অস্বস্তি হয়। মনে হয়, সুরের রেশটাই যেন কেটে গেল।

তোমার যত বাজে কল্পনা। হাততালি, এন্‌কোর— এসব তো তোমার প্রাপ্য। শিল্পীর ওই তো সম্মান।

শিল্পী? আমি বুঝি শিল্পী!

নও?

কী জানি। হ'তেও পারি, কিন্তু তোমার মুখে ওই জমকালো কথাটা শুনলে কেমন যেন হাসি পেয়ে যায়। যাই এবার, রান্নার যোগাড় করি।

আজ থাক না ওসব হাঙ্গামা! বরং বাইরে থেকে কিছু খাবার কিনে আনি। তোমার গলা ধরা-ধরা লাগছে। তুমি বরং গরম জলে নুন মিশিয়ে গলাটা খানিক গারগ্ল ক'রে নাও।

এই রাত্রে আবার গারগ্ল কেন?

তোমার গলা ভালো হবে। গলা ভালো হ'লে গান ভালো হবে।

আমার গান ভালো হ'লেই তোমার আনন্দ?

আমার আনন্দ। আমার গর্ব।

এই, একটু বোসো না এখানে! আমার মাথা ঘুরছে। তোমার কাঁধে একটুখানি রাখি।

ওরা ভালো না। তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমি আজ টের পেয়েছি।

কিসে টের পেলে?

বলব? বকবে না তো? আজ সন্ধ্যাবেলা এই জানলাটায় কান পেতেছিলুম। পাল্লা দুটো ঠিক জোড় লাগে না তো, একটুখানি ফাঁক থেকেই যায়, ওদিককার সব কথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

শুধু শুনলে? শুনেই টের পেলে?

তুমি বাপু পেট থেকে কথা টেনে বার করতে পারো। যাক বাবা, যা করেছি, স্বীকার ক'রেই ফেলি। ওই ফোকরে চোখও রেখেছিলাম।

ছিঃ, লিলি!

ছি তুমি আমাকে বোলো না, বোলো ওই বউটাকে। মাগো, কী বেহায়া, যদি একবার দেখতে!

ফোকরে চোখ রেখে কতখানি বেহায়াপনা দেখেছ তুমি?

চেঁচিয়ে তো বলতে পারব না। আর-একটু কাছে এসো, কানে-

কানে বলি। ওই বউটার চেহারার মধ্যেই বেহায়াপনা আছে, বুঝলে? অমন যে কালো-কালো চোখ দেখ—

কই, দেখি না তো! পরস্ত্রী না?

খালি তর্ক। নাই বা দেখলে, ভেবে নিয়েছ তো? ওই কালো চোখের রং কিন্তু আসল নয়, বুঝলে? সুর্মা দিয়ে-দিয়ে ও চোখ দুটিতে শান দিয়েছে। ওর টানা-টানা ভুরু দুটিও আসল কিনা, কে জানে।

বুঝলুম। বউটি সুর্মা মাখে, আর?

আর কী বলব। ওর সাজপোশাকের ছিরি-ছাঁদও ভালো না। খাটো জামা, আঁটো ছাঁট, পেট-খোলা, পিঠ-দেখানো। আর লাল কষে ঠোঁট রাঙানো।

এই, মাত্র এই?

আর ও বড়ো ফিনফিনে শাড়ি পরে বাপু, শায়ার রং, নকশা, সব স্পষ্ট দেখা যায়। যাও, আমি আর-কিছু বলতে পারিনে। লজ্জা করে না বুঝি?

আর কী দেখেছ, তাই বলো।

বউটা বারান্দায় ব'সে পান সাজছিল। ওর স্বামী এল। একটা পান তুলে মুখে পুরল। বউটা বকল। ওর স্বামী বসল উঠনে-রাখা দড়ির খাটিয়াটায়। আর তখনই— সব শুনবে?

সবই শুনব।

আর তখনই একটা লোক আস্তে-আস্তে দরজা ঠেলে ভিতরে এল। তার টেরির বাহার যদি দেখতে! ফিনফিনে সিল্কের জামা— অমন জামা তুমি কোনোদিন পরোনি।

পরব কী ক'রে? দু-বছর ধ'রে বেকার যে।

কাজ পেলেও ওরকম জামা তোমাকে পরতে হবে না, ব'লে দিচ্ছি।

যাক, তারপরে কী হ'ল, বলো।

বলছি, বলছি। তোমরাই আবার বলো, মেয়েদের সব ব্যাপারে বেশি-বেশি কৌতূহল। বউটা কী করল জানো, এক খিলি পান নিজের হাতে দিল লোকটার মুখে তুলে। লোকটা ওর হাতে একটু চাপ দিল।

এত দেখেছ?

চোখে প'ড়ে গেলে কী করব, বলো!

আর ওর স্বামী?

একটা বিড়ি ধরাল। বিড়ি ধরতে চাইছিল না। জলছিল আর নিবছিল। বোধ হয় হাওয়ায়।

হাওয়ায় নাও হ'তে পারে।

তবে কিসে?

তুমি হয়তো ভালো ক'রে দেখতে পাওনি, হয়তো ওর হাত কাঁপছিল।

কাঁপছিল? তা হ'তে পারে।

এও হ'তে পারে, লোকটা হয়তো বিড়িটা ধরাতেই চায়নি। ঠোঁট দিয়ে চেপে রাখার নিয়ম তো, ও হয়তো দাঁত দিয়ে কামড়ে রেখেছিল।

কী জানি। ওসব ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো। কামড়াবে কেন?

কারণ তো কতই হ'তে পারে। জ্বালায়, রাগে।

ও। জ্বালা কেন, রাগই বা কেন?

পুরুষদের নিয়ম। ওরা জ্বলে, রাগে।

কিন্তু এ-লোকটা হয়তো রাগেনি। কেননা, ওই লোকটাকেই একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'দেশলাই আছে?' লোকটা ছুঁড়ে দিল বাক্স, তুলে নিয়ে তাই দিয়েই এই লোকটা, মানে মেয়েটার স্বামী বিড়ি ধরিয়ে নিল। ওর হাত কাঁপছিল।

ভীতু, কাপুরুষ।

ওরা— মেয়েটা আর নতুন লোকটা কী করছিল, জানো? ঘরের ভেতরে গিয়ে কী লুটোপুটি আর খিলখিল হাসি!

তুমি দেখছিলে?

না, শুনছিলুম।

আর ওর স্বামী?

আড়চোখে এদিক-ওদিক চাইছিল। মাঝে-মাঝে খুকখুক ক'রে কাশছিল।

বিড়িটা খুব কড়া ছিল বোধ হয়।

বোধ হয়। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো? ও হয়তো কাশি দিয়ে ও-ঘরের খিলখিল শব্দটা চাপা দিতে চাইছিল। আমি যাতে শুনতে না পাই। কেউ যাতে শুনতে না পায়।

হবে। অভাবে স্বভাব নষ্ট, জানোই তো লোকটার হয়তো কাজকর্ম কিছু নেই।

চাকরি তো তোমারও এখন নেই। তাই ব'লে তুমি কি—

দেখ, আমাদের কথা টেনে এনো না। আমাদের সম্ভ্রমবোধ আছে, মনুষ্যত্ববোধ আছে। আমরা আলাদা। আর তুমি তো শিল্পী। অসুন্দর কোনো-কিছু আমাদের জীবনে ঘটতে দেব কেন? ওরা ভালো না। যাক, কন্‌ফারেন্সের গান তৈরি হয়েছে?

একটু-একটু।

একটু-একটু? দেখ লিলি, এইজন্যেই তোমার ওপর মাঝে-মাঝে এমন রাগ হয়। আর ক'দিন বা বাকি— এখনও পুরোপুরি তৈরি হ'ল না কেন?

তোমাকে সত্যি কথা বলব? গলার কসরতী গান গাইতে আমার মোটে ভালো লাগে না। ওদের কায়দা আছে, প্রাণ নেই। তার চেয়ে

সেই গানগুলো গাইতেই আমার বেশি ভালো লাগে যেগুলো তোমাকে আগে গেয়ে শোনাতাম। বিয়ের আগে— মনে আছে? আমার কোলে মাথা রেখে তুমি শুনতে। আমি থেকে-থেকে শিউরে উঠতাম। মাঝে-মাঝে আঙুল বাড়িয়ে তুমি আমার ঠোঁট ছুঁতে, আমার স্বর কেঁপে যেত, মনে আছে?

তোমার শুধু ছেলেমানুষি, শুধু উচ্ছ্বাস।

হাত বাড়িয়ে তুমি আমার খোঁপাটা সুদ্ধ নেড়ে দিতে, চুল এলোমেলো হ'ত, ফুল খ'সে পড়ত। তুমি বলতে, সব স্বর ফুল হ'য়ে ঝ'রে পড়ল,— মনে নেই? আজ শুনবে সেই গানের একটা?

লিলি, তোমাকে আজ ভূতে পেয়েছে। নাও, এবার ওঠো দেখি। গরম জলে গলাটা সাফ ক'রে ফেলো। দেখবে সর্দি-কাশি-শ্লেষ্মার মতো এসবও ঝ'রে যাবে। আজ বাদে কাল কন্‌ফারেন্স। কত খাতির, কত খ্যাতি!

তাতে তোমার কী?

লিলি, এমন তেতো-তেতো গলায় কথা বোলো না। ধাত্রীর যে-গর্ব, আমারও তাই। তোমার প্রতিভাকে আমি লালন করছি। গর্ব হবে না?

তুমি আজও ওইদিককার জানলা খুলেছিলে?

কই, না তো!

লিলি, মিছে কথা বোলো না।

তুমি বুঝি চুপি-চুপি ফিরে এসে আড়ি পেতেছিলে?

আমার আড়ি পাতবার দরকার নেই, লিলি, এমনিতেই টের পাই। ওই জানলার ওপর মাকড়সার জাল পড়েছিল, সেটা নেই কেন?

বাব্বাঃ, তোমার চোখ! তুমি দারোগা হ'লে না কেন? অথবা শখের গোয়েন্দা?

ফাজলামো কোরো না।

যদি বলি, জালটা হাওয়ায় ছিঁড়ে গেছে?

মিছে কথা।

যদি আমিই ঝুলটা পরিষ্কার ক'রে থাকি?

দেখ, মিছে কথা দিয়ে মিছে কথা ঢেকো না। তুমি জানলা খুলেছিলে লোভে প'ড়ে। ওই ইতর পরিবারটি তোমাকে টানছে।

বাজে কথা! আমি ওদের ঘৃণা করি। আজ কী দেখলাম জানো? ওরা দু-জন সেজেগুজে সিনেমা না থিয়েটার দেখতে বেরোল, আর ওর স্বামী নিজে একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে দিল!

হুঁঃ!

এখনও রাগ পড়ল না? শোনো মশাই, আরও বলি। ওর স্বামী নির্লজ্জের মতো লোকটার কাছে একটা সিগারেট চাইল, লোকটা আস্ত একটা টিন গুঁজে দিল ওর হাতে।

নিল?

বা রে, নেবে না? ও একটার পর একটা সিগারেট ধরাতে থাকল—কী সুন্দর গন্ধ, ওরকম সিগারেট তুমি কোনোদিন খাও না।

খেতে চাই না।

লোকটা গোটা টিনই শেষ ক'রে আনল বোধ হয়। ও এত সিগারেট খায়?

আমার মনে হয়, ও সিগারেট খাবার জন্যে খাচ্ছিল না, সিগারেট দিয়ে আসলে ও সময় মাপছিল—কতক্ষণে ওরা ফিরে আসে। যাক, এই নাও।

কী এটা?

রেডিও-প্রোগ্রামের কনট্রাক্ট। ডাক-বাক্সে এসে প'ড়ে ছিল। কাল সই ক'রে দিয়ো, সকালেই পৌঁছে দিয়ে আসব।

কবে প্রোগ্রাম?

ষোলই!

সেদিনই কন্‌ফারেন্স নয়?

ক্ষতি কী!

একদিনে দুটো পারব?

লিলি, পারতে হবে। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে-নিয়ে যাব— কন্‌ফারেন্সটা দুটো সিটিং-এর পরে পড়েছে, এই যা রক্ষে। আমি সব ঠিক ক'রে দেব। তুমি শুধু গানগুলো তৈরি ক'রে নাও।

আমার জন্যে সারাদিন ঘুরবে তুমি?

আমার আর কাজ কী। সেদিন না-হয় দরখাস্ত পকেটে ক'রে অফিসে-অফিসে নাই বা ঘুরলুম। চাকরি দেবে ব'লে কেউ তো আর ব'সে নেই! লিলি, আমাদের বাঁচতে হবে।

এভাবে বাঁচা যাবে?

এভাবেই তো বাঁচতে হবে। নইলে আমাদের সুন্দর অনুভূতি— এসব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে না? আমরা— আমরা হয়তো ওদের মতো হ'য়ে যাব।

ওদের মতো?

হ্যাঁ, ওদের মতো। ওরা, যারা ভালো না।

তোমার পায়ে পড়ি, রেডিওর দুটো সিটিং সেরেছি, আমাকে আর কন্‌ফারেন্সে টেনে নিয়ো না।

লিলি, ছিঃ, আবার পাগলামি?

তুমি বিশ্বাস করছ না, আমার জ্বর এসেছে। দেখ, আমার কপালে হাত দিয়ে দেখ, গলায় হাত রাখো, দেখবে পুড়ে যাচ্ছে।

ছিঃ, মণি, অস্থির হোয়ো না। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে নিয়ো, খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়েও নিয়ো, দেখবে ভালো লাগবে। আর একটি ঘণ্টা বৈ তো নয়।

কিন্তু আমি আর পারছি না যে! মাথা ছিঁড়ে পড়ছে।

আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, টিপে দিচ্ছি।

তেতো ওষুধের শেষ দাগ গেলার মতো হবে তোমাদের এই কন্‌ফারেন্স।

গান গাওয়া ওষুধ গেলার মতো হ'ল?

কন্‌ফারেন্সে গাওয়া তাই। আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, দেখবে আমি সেরে যাব—তোমাকে গুনগুন ক'রে অনেক গান শোনাব, যত শুনতে চাও।

বাড়ি গিয়ে গান শোনাতে পারবে, ভেবেছ? আজ ওখানে টিকতেই পারবে না! দুটো সিটিং-এর মাঝে তোমাকে রেডিও-স্টেশনে রেখে বাসায় গিয়েছিলাম না? গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হ'ল।

গন্ধ কিসের?

মদের! দেখি, ওই বউটার স্বামী দুটো সোডার বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকল। একটু পরেই বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ হ'ল ভিতর থেকে।

আর?

উঠনের খাটিয়ায় হিমের মধ্যে ব'সে কয়েকটা নোট গুনল, ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখল।

ছি-ছি-ছি!

টাকার জন্যে ওরা সব পারে। রুচি নেই ব'লেই ওরা এতটা নিচে

নেমে গেছে। লিলি, আমাদের জীবনে এই রুচিটুকু বাঁচিয়ে রাখব ব'লেই তো এত লড়াই করছি। তুমি অবুঝ কেন?

না, আর অবুঝ হব না। চলো, কন্‌ফারেন্সে নিয়ে চলো।

দাও, ওই জানলাটা বন্ধ ক'রে দাও, কিছু যেন চোখে না পড়ে, একটুও গন্ধ যেন নাকে না আসে।

দাও, তুমিই বন্ধ ক'রে দাও। আমি ভীষণ ক্লান্ত। আর পারছি না। মাথা ঘুরছে।

চোখ বুঁজে খানিক শুয়ে থাকো। আমি তোমাকে ডেকে তুলে খাওয়াব। লিলি, শরীর এখন একটু সুস্থ বোধ করছ কি?

একটু। জ্বর বোধ হয় আর নেই। মাথায় হাত দিয়ে একবার দেখ না।

জামাটা একটু ঢিলে ক'রে দাও, নিশ্বাস নাও আস্তে-আস্তে, আরও ভালো লাগবে। লিলি, দেখ তো, কী ছেলেমানুষি করতে যাচ্ছিলে? কন্‌ফারেন্সে যেতেই চাইছিলে না। আমি জানতাম, গান গাইলেই তোমার মন ভালো হবে, সেই সঙ্গে শরীরও। তুমি শিল্পী— আর্টের কাছে শরীরটা তুচ্ছ হবেই। আজ যদি না গাইতে, তবে? জানো লিলি, তুমি যখন গাইছিলে, ঘন-ঘন হাততালি পড়ছিল। আমি সকলের মধ্যে ব'সে দেখছিলুম, লোকের চোখে-মুখে প্রশংসা। গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছিল। যদি গানের আসরে না যেতে, তবে পেতে সকলের এই প্রীতি, এই প্রশংসা?

না। আরও একটা জিনিস পেতাম না।

কী জিনিস, লিলি?

টাকা। তোমার পকেটে রেডিওর চেক আছে। আর কন্‌ফারেন্সে ওরা কত দিল? একশো টাকা দিয়েছে না?

দিয়েছে।

কত হ'ল সবসুদ্ধ? দেড়শো? না, একশো ষাট?

লিলি, ওটাকে শুধু টাকা ব'লে ভেবো না।

টাকা ছাড়া আবার কী! এ-মাসের বাড়িভাড়া, তিন হপ্তার রেশন, তাই না?

লিলি—

আঃ, আর বোকো না, আমাকে বকিয়ো না। একটু ঘুমতে দাও।

লিলি, আমি তোমার চুলে একবার হাত বুলিয়ে দেব?

না— না— না। তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।

লিলি, ছিঃ, কী অস্থিরতা শুরু করলে। একটু জিরোও, ঘুমও। এখন পুরো তিনটে দিন তো তোমার ছুটি। গ্রামোফোন কোম্পানির অডিশন তো সেই বুধবার, না?

ভয় নেই গো, সেটাকেও আমি উতরে দেব। তুমি যা চাও, ঠিক তাই— তাই হবে। তোমাকে আমি চিনেছি।

ছি, লিলি, চিৎকার কোরো না। ওরা শুনতে পাবে।

শুনুক না। আজ আমার কোনো লজ্জা নেই।

লিলি, তোমার চোখের চাউনি ঘোলাটে লাগছে, তোমার হাতের আঙুলগুলো শক্ত, তুমি হঠাৎ উঠেই বা বসলে কেন?

বসলুম, তোমাকে একটা কথা বলব ব'লে।

ওরা যদি শোনে, যদি আড়ি পাতে?

ওদের তোমার ভারি ঘেন্না, না? ওই বউটা অন্য লোককে শরীর দিয়েছে, এইজন্যে তো? আর তাতে ওর স্বামীর সায় আর সহায়তা আছে ব'লে?

লিলি, আস্তে বলো।

আর আমাকে দিয়ে তুমি বিক্রি করিয়েছ আমার গান। আর্ট আর্ট ব'লে বড়াই করো না? সেই আর্ট।

লিলি!

কে জানে কে বেশি দিয়েছে, কে বেশি খুইয়েছে, আমি, না ওই বউটি। কার পাপ বেশি, ওর স্বামীর, না তোমার? শরীর দিয়ে বউটির হয়তো কিছু বেঁচেছে, কিন্তু আমি যে আমার সব বিকিয়ে দিলুম, দেব, দিচ্ছি!

লি-লি!

থামো, গলার জোর দেখিয়ো না। না, না, জানলার ফোকরটা তাড়াতাড়ি বুঁজিয়ে দিতে যেয়ো না। একটু বমি-আসা গন্ধ আসুক না, না-হয় একটু খিলখিল হাসি শুনি! ওরা খারাপ বটে, কিন্তু আমরাও তো ভালো নই! জাতে একই। বরং জানলার পাল্লা দুটো ঠেলে দাও, একেবারে খুলে যাক, একাকার হোক।

লি—লি!

. . . . . . . . . . . . . . . .

# জীয়ন-কাঠি

### এক ॥ মণিকার কথা

আমি জানি, ওরা আমাকে মারবে।

ওরা— মানে প্রীতিলতা আর, আর আমার স্বামী। দু-জনে এক-সঙ্গে। আমি ওদের চোখে হত্যার ষড়যন্ত্র পড়তে পেরেছি। ওদের মনের ইচ্ছে, যে-ইচ্ছে দুটি এখন এক হয়েছে, আমি ধ'রে ফেলেছি। ওরা আমাকে মারবে। মারবেই। আমি রেহাই পাব না।

ওদের মনে ঘৃণা, চোখে কঠিন নিষ্ঠুর সংকল্প। ওরা লুকোতে চায়, মিষ্টি-মিষ্টি হাসি আর মিছে বুলি দিয়ে থাকে। তাতে কি আমি ভুলি! ওরা ডালে-ডালে থাকে, আর আমি— শ্রীমতী মণিকা রায়— থাকি পাতায়-পাতায়।

আমার নাম, এক্ষুনি বললুম, শ্রীমতী মণিকা রায়। আগেকার কাল হ'লে দাসী লিখতাম, কারণ আমরা ব্রাহ্মণ নই। এখন সব মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছে— মানবী হই আর দানবী হই, আমরা সবাই দেবী। বিয়ের আগে অবশ্য পদবীটাই লিখতাম— সোম। আমার স্বামী 'দেবী' লিখতে শেখালেন, বিয়ের পরে।

আমার নাম মণিকা রায়, আমার বয়স— মেয়েরা কি কখনও আসল বয়স বলে? ছেলেরা লুকোয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের পর— যখন বিকেলের দিঘিতে পাড়ের হেলানো খেজুরগাছের মতো জীবনে চল্লিশ ছায়া ফেলে। যা-ই হোক, আমার বয়স এই সাতাশ। ব'লেই ফেললুম, কারণ,

যার সব গিয়েছে, সে আর লুকিয়ে নিজের বয়স জমিয়ে-জমিয়ে কী করবে!

নাম মণিকা রায়, বয়স সাতাশ। সধবা— দেখতে পেলে অবাক হ'য়ে যেতেন— কেমন টকটকে লালপাড়ের শাড়ি পরেছি, সিঁথির সিঁদুরের রেখাটি কী চওড়া! লুকোতে মোটেও চেষ্টা করিনি। আজকাল অনেক বউ যা করে, সিঁদুরের চিহ্ন ঢেকে-ঢুকে রাখে, মাথায় ভুলেও ঘোমটা তোলে না।

তা, আমি একটু সেকেলে। চলনে, চেহারায়, ধরন-ধারণে। আমি, অর্থাৎ শ্রীমতী মণিকা রায়, যার বয়স সাতাশ।

আমার স্বামীর নাম রতীন, শ্রীরতীন্দ্রনাথ রায়। জানি, স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী। কিন্তু নাম তো আমি ধরছি না, লিখছি। আর ধরলেই বা দোষ কী ছিল— আজকাল ওসব কেই বা মানছে!

আমার বিয়ে হয় আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে, ফাল্গুন মাসের এগারোই তারিখে। এখনও ঠিক মনে আছে— ক'টায় লগ্ন ছিল তাও। রাত্রি দেড়টায়। আমার ঘুম পেয়েছিল, আমি হাই তুলেছিলাম, ঢ'লে-ঢ'লে পড়ছিলাম। আমরা মফস্বলের মেয়ে, বেশি রাত অবধি জেগে থাকবার অভ্যাস তো ছিল না! সন্ধ্যাবেলা ওরা এসে পৌঁছেছিল, পাশের জমিদারদের কাছারি-বাড়িতে ওদের থাকবার জায়গা ঠিক হয়েছিল, এসব আমি জানতাম। ওরা আসবার সঙ্গে-সঙ্গে শাঁখ বেজেছিল, উলুটুলু দিয়ে সবাই হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল। আমি জানলার পাল্লা একটু আলগা ক'রে লুকিয়ে দেখছিলাম। কাকে? ওকে? কিন্তু ওকে আমি চিনতাম না তো? তখনও চিনতাম না। ওই যে-ছেলেটা গড়গড় ক'রে কথা ব'লে চলেছে, ওই কি? না, ও কী ক'রে হবে। বরেরা তো বেশি কথা বলে না। অন্তত এই একটি দিনে তাদের লাজুক হ'তে

হয় ব'লে শুনেছি। তবে আয়নার সামনে ব'সে যে তখন থেকে চুল আঁচড়ে চলেছে, সেই কি? সে, না যে দাড়ি কামাচ্ছে, সে? আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ওদেরই একজন তাসের ম্যাজিক দেখিয়ে হাসাচ্ছে বাকি সবাইকে, আর-একজন গান ধরল হেঁড়ে গলায়— হে ঈশ্বর, ও যেন আমার বর না হয়।

না, সে নয়। আমার ছোড়দি ওকে চিনত। সে-ই আমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিল। ওই, ওই যে। চোরের মতো এদিক-ওদিক চাইছে না? ওই তো রতীন, তোর বর।

তখন আমি দেখলুম ভালো ক'রে। কপালটা একটু বেশি চওড়া, কিন্তু চুল দিব্যি ঘন, টেরি-কাটার ধরনটিও বড়ো পরিপাটি। গায়ের রং না-ফর্সা না-ময়লা, কিন্তু চোখ দুটির দৃষ্টি খর। খানিক আগে, এর দিকে চোখ পড়েনি, আমি ভাবছিলাম যে-ছেলেটি তাসের ম্যাজিক দেখিয়ে সকলকে ভোলাচ্ছে, সে যদি আমার বর হ'ত, তবে বেশ হ'ত। ওর রং ফর্সা, চোখ ঢুলুঢুলু। কিন্তু যে-মুহূর্তে ছোড়দি বলেছিল, ও নয়, ওই চোরা-চাউনিওলা লোকটাই আমার বর, তখন থেকেই আমি শুধু তাকেই দেখতে থাকলুম। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলুম আর ভাবলুম, এর মতো আর কেউ নয়।

আর মনে হ'ল, ওর চোখ দুটি চঞ্চল বটে, কিন্তু মুখখানি কেমন যেন শুকনো। ও কি উপোস করেছে? আজকালকার ছেলেরা এসব মানে না ব'লে শুনেছি, লুকিয়ে খেয়ে আসে, ও যদি তা না ক'রে থাকে, তবে তো বুঝতে হবে নেহাৎ ভালোমানুষ!

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, শাঁখ বাজল, আমাকে ওরা সবাই মিলে সাজাতে বসল।

সে কি যে-সে সাজ? লাল বেনারসী, জরির কাজ-করা ব্লাউজ

ইত্যাদি। আর কলতলায় নিয়ে গিয়ে আমাকে কতবার যে ওরা মুখ আর পায়ের পাতা ঘষিয়ে নিল! মুখে সাবান মাখলুম ফিরে-ফিরে, পায়ে শুধু ঝামাই ঘষলুম। তারপর স্নো, তারপর আলতা, তারপর কুমকুম, তারপর টিপ।

ফাঁসির খাওয়া ব'লে একটা কথা আছে শুনেছিলাম। আসামী শেষ-বারের মতো আশা মিটিয়ে খেয়ে নেয়। আমার এই সাজও যে ফাঁসির সাজ। নইলে এত ঘটা কেন।

আমাকে ওরা যখন বারবার স্নানের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আরও একটা উপমা এসেছিল মনে। বলির ছাগ। তাকেও স্নান করায়, তেল-সিঁদুর মাখায়, ফুলের মালা পরায়।

ছি, নিজেই পরে মনে-মনে বলেছিলাম, ওসব কথা ভাবতে নেই।

বিয়ের পিঁড়িতে ব'সেও ঢুলেছি, কী ঘটছিল ভালো ক'রে টের পাইনি। বাবা কতগুলো মন্ত্র পড়ছিলেন আর আমাদের ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সকলকেই আমি আলাদা-আলাদাভাবে চিনি, কিন্তু তখন চিনতে পারছিলাম না। সব মুখ এক হ'য়ে ঝাপসা একটা আকৃতি, একটা কৌতূহলের বৃত্তাংশের মতো লাগছিল। আমার হাত ঘটে, একটি হাত আমার হাতের ওপর এসে পড়ল।

আমি তখনই শিউরে উঠলাম, আমার ঘুম ছুটে গেল।

শুভদৃষ্টির সময় আমি ওকে ভালো ক'রে দেখে নিয়েছিলাম। ও-ও আমাকে দেখেছিল।

বাসরের কথা বাদ দেব। ওখানে ওরা বড়ো বিশ্রী ইয়ার্কি করে, স্ত্রী-আচার যেন আর ফুরোয় না।

আমার স্বামী গান জানে। আমি জানি না।

সকলে চ'লে গেলে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন প্রায় ভোর হ'য়ে এসেছে। আমি জড়োসড়ো হ'য়ে একপাশে, ও আর-একপাশে। কে জানে, হয়তো আমরা কেউই ঘুমইনি। আলো যখন ফোটে-ফোটে, তখন আমাকে আস্তে-আস্তে কে ঠেলছে, টের পেলুম। চেয়ে দেখি, আবার কে, ও।

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল মশারির ফাঁক দিয়ে, আমার রোমাঞ্চ লাগছিল। তবু আমি ভালো ক'রে চোখ মেলে চাইতে পারিনি ওর দিকে, সংকোচ, লজ্জা, আরও যত-কিছু বালাই মেয়েমানুষের আছে, সব যেন চেপে বসেছিল।

ও বলল, 'মণি, চোখ খোলো।'

মণি! ও কি আমায় মণি ব'লে ডাকল? আমি কি ওর মণি? নয়নের?

তবু কিন্তু চোখ খুলিনি। আসলে লজ্জা করছিলুম আমি নিজেকেও। সিঁদুর বোধ হয় সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আছে, চুল আলগা, ওকে আমি এ-মুখ দেখাব কেমন ক'রে।

ও জোর ক'রে আমার চোখ খুলিয়ে ছাড়ল।

বললাম, 'হয়েছে?'

ও বলল, 'এখনি? শুরুই যে হয়নি।'

আমার কান আবার লাল হ'য়ে উঠেছিল, আমি আবার চোখ বুঁজেছিলাম।

ও আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'কী দেখছি, বলো তো?'

ফস ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমাকে।' ব'লেই জিভ কাটলুম। ছি ছি, আমি কী বেহায়া!

ও বলল, 'ঠিক।' তারপর আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার

অপলক চোখে দেখতে থাকল। বুঝলাম, যাচাই করছে। আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল, আমি লুকিয়ে সন্তর্পণে শাড়ির আঁচলেই মুখ মুছে নিচ্ছিলুম।

চেয়ে দেখি ও-ও হাসছে। তখন আমার সাহস বাড়ল। ওর যে-হাতটা আমাকে ছুঁয়ে ছিল, সেটায় আলগোছে একটু চাপ দিলুম।

ও বলল, 'কী ?'

আমি বললুম, 'কিছু না।'

'আমাকে পছন্দ হয়েছে ?'

আমি উত্তর দিতে গিয়ে আঁচলেই মুখ ঢেকে ফেললুম।

ও সেই আঁচল ধ'রে টানল। ঘোমটা সরাতে দিলুম না, আমার মুখের আধখানা ঢাকাই রইল।

ও যেন রাগ করল। 'তুমি আমার কথার জবাব তো দিলে না। নিজেও জিজ্ঞাসা করলে না তো কিছু।'

ফিসফিস ক'রে বললুম, 'কী জিজ্ঞাসা করব ?'

'এই— এই তোমাকে আমার পছন্দ হয় কিনা।'

চোখ মিটমিট ক'রে বললুম, 'জিজ্ঞাসা করব কী, আমি তো জানিই। আমাকে তো আপনার মনে ধরেনি। আমি দেখতে বিচ্ছিরি।' ব'লে আমি দুষ্টুমি ক'রে হাসছিলাম।

'ছাই বুঝেছ', ও বলল, 'তুমি দেখতে খু-উ-ব সুন্দর।' ব'লে আমাকে সজোরে টানল।

তখন ভোর হ'য়ে আসছে।

এখন মাঝে-মাঝে অবাক হ'য়ে ভাবি, আমাকে ওরা মারবে, এ-কথা কবে প্রথম ঠিক করল। কবে প্রথম কথাটা ওদের মনে এল। কার মনে প্রথম কথাটা এল। আমার স্বামীর, না প্রীতিলতার।

মারবে, কথাটা প্রথম হয়তো ঠিক এইভাবে মনে আসেনি। প্রথমে শাদা মেঘের মতো অস্পষ্ট ইচ্ছাটা মনের ঈশান কোণে দেখা দিয়েছে। ইচ্ছাটা গাঢ় হয়েছে তারপরে। আরও পরে কালো হয়েছে।

প্রথমে হয়তো আমার স্বামী ভেবেছেন মণিকা যদি মরে, তবে বেশ হয়।

প্রীতিলতা ভেবেছে, পথের কাঁটা, এই আপদটা দূর হয় না?

ওরা দৈবের সহায়তা চেয়েছে। দূর যে ক'রে দিতে পারে নিজেরাই, সেই ধারণাটা তখনও সংকল্পের আকার নেয়নি। যখন নিল তখনও ওরা ভরসা ক'রে এ ওর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারেনি। পাছে একজন আর-একজনের কাছে ছোটো হ'য়ে যায়। তাতে ওদের ভারি ভয়। ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে কিনা!

তারপর একদিন ওরা নিজেদের সেই ভয়ংকর ইচ্ছা বিনিময়ও করেছে। প্রীতির ইচ্ছা হয়েছে আমার স্বামীর, আমার স্বামীরটা হয়েছে প্রীতির। উভয়ের মিলে এখন শুধু সুযোগ খুঁজছে।

আমি জানি। জানি ওরা আমাকে হত্যা করবে।

মাঝে-মাঝে ছেলেমানুষি কত কী যে খেয়াল চাপে! ভাবি, মারবে যে কী উপায়ে? ভাবতে মজা লাগে। ওরা কি পদ্ধতিটাও ঠিক ক'রে ফেলেছে?

এমন হ'তে পারে, আমি ঘুমিয়ে আছি হঠাৎ আমার স্বামীর একখানা হাত আমার গলায় পড়ল। তারপর? আমি তো ঘুমিয়ে থাকব, টেরও পাব না, ওর আঙুলগুলো কখন হিংস্র আর ছুঁচলো হ'য়ে আমার গলায় বিঁধবে।

আমি কষ্ট পাব, আমার দম বন্ধ হবে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে

আসবে বাইরে, ভয়ে যন্ত্রণায় আমি চেঁচিয়ে উঠতে যাব, কিন্তু গলায় স্বর ফুটবে না, আমার মুখ কাগজের মতো শাদা আর ফ্যাকাশে হ'য়ে যাবে, আমার মৃত অপলক চোখের মণি ব্যথিত-বিস্মিত ভঙ্গিতে আমার স্বামীর দিকে চেয়ে থাকবে।

ও তখন কী করবে? কৃত-কাজের জন্য অনুশোচনা? আমার প্রাণ-হীন, সাড়াহীন দেহটার দিকে চেয়ে ওর মনে এতটুকু করুণাও কি জমবে না? তারপর আস্তে-আস্তে আমার ঠোঁটের কোণ যখন কালচে হ'য়ে শিটিয়ে আসবে তখন ওর মনের কোণে হারানো পুরনো ভালোবাসার খানিকটা হয়তো ফিরতেও পারে।

হয়তো ওর বুকের ভিতরটা উদ্বেল হ'য়ে উঠবে, আমাকে ও আবার আদর করতে চাইবে, আমাকে, আমার দেহটাকে।

ওই দেহটায় তখন যেমন সাড়া থাকবে না, তেমনই সংকোচও থাকবে না। আমার কানে-কানে গদগদ মৃদুস্বরে ও যদি কিছু বলে, আমি তার জবাব দেব না সত্যি, কিন্তু আবেগের অধীরতায় নির্লজ্জ কিছু করতে যায়, তখন বাধা দিতেও তো পারব না, কপট অনিচ্ছায় অনেকবার যেমন দিয়েছি?

ওর ওষ্ঠ আমার উপরে আনত হ'য়ে পড়ে যদি, আমি সে-ছোঁয়া পাব না, কিন্তু আমার ঠোঁটের, আমার কপালের হিম ও পাবে। আমার শীতলতা ওকে আড়ষ্ট করবে। ও ভয় পাবে।

তারপর সকালের হাওয়ায় জানলার পাল্লা খুলে যায় যদি, ও তখন হয়তো হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠবে, কারণ, রক্ত-মাংস-মজ্জা ব'লে কিছু তো তখন ওর থাকবে না, ও তখন কয়েকটি স্নায়ুর পুঁটুলি হবে।

ভয় যখন পাবে, তখন কী করবে ও, আমার স্বামী? আমি জানি, ও কী করবে। আর সকলে যা ক'রে থাকে, তাই করবে।

হয়তো ডেকে আনবে প্রীতিলতাকে, প্রীতি ভয়ে হয়তো ঘরে ঢুকবে না, তখন তাকে ইশারায় আমার নিথর শরীরটা দেখিয়ে দেবে।

প্রীতি— শত হ'লেও মেয়েমানুষ— দু-হাত দিয়ে চোখ ঢাকবে। ছুটে পালাতে চাইবে— কিন্তু পালাতে ও দেবে কেন, আমার স্বামী ? প্রীতির আঁচল সে চেপে ধরবে। প্রীতি ছটফট করছে, আর তার শাড়ির কোণ আমার স্বামীর হাতের মুঠোয়— মূক অভিনয়ের দৃশ্যটা আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

আমার স্বামী ইঙ্গিতে ওকে বলবে, পালাবে কোথায়— পথ নেই। আমার পাপের ভাগ নিতে হবে না ? সমান শরিক আমরা দু-জনে।

নিরুপায় প্রীতি তখন আমার স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে—

না, অভব্য কিছু নয়। সেসব কিছু করতে পারবে না। তখনও আমি ও-ঘরে রয়েছি না ? হলামই বা মৃত। মরা মানুষকে সাক্ষী রেখেও কি কোনো পুরুষ আর নারী অসংযত কোনো আচরণ করতে পারে ?

আসলে ফিসফিস ক'রে প্রীতিলতা আমার স্বামীকে পরামর্শ দেবে। বলবে, 'ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার যদি একটা সার্টিফিকেট দেয়, তবে আর ভয় নেই। অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে মৃত্যু— বা ওইরকম একটা কিছু। নইলে তুমি বাঁচবে কী ক'রে ?'

'বাঁচব না ?' আমার স্বামী আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠবে।

প্রীতি বলবে. 'না। পুলিশ আসবে।'

'পুলিশ ?'

'হ্যাঁ।'

তারপর ? আমার যদি উপায় থাকত, গলা থাকত, আমি তখন খিলখিল ক'রে হেসে উঠতুম। হাততালি দিয়ে ব'লে উঠতুম, তারপর আইন-আদালত, বিচার, সাজা, ফাঁসি।

ওরা আমার লাশ গুম করতে চেষ্টা করতেও পারে। এরকম অনেক খবর পড়েছি। কী বীভৎস সব বর্ণনা, মাগো! ওরা দরজা ভেজিয়ে দেবে সন্তর্পণে। তারপর কাটারি দিয়ে এই দেহটাকে কুচিকুচি ক'রে কেটে বস্তায় পুরে— সেসব কথা ভাবতেও গা গুলিয়ে ওঠে।

আমাকে মারবার আরও তো কত উপায় আছে। নিরস্ত্র অসহায় একটি মেয়ে, আর তার নিষ্ঠুর বিরূপ অন্য-নারীতে-আসক্ত স্বামী। আমাকে মেরে ফেলবার সুযোগের অভাব তো ওর হবার কথা নয়। আমার খাবারে মিশিয়ে দিতে পারে বিষ, আমাকে খুন ক'রে ঝুলিয়ে দিতে পারে কড়িকাঠে, যাতে ব্যাপারটা আত্মহত্যা ব'লে চ'লে যায়। আবার ধরো, আমি অন্যমনস্ক আছি, ওরা আমার গায়ে ঢেলে দিল কেরোসিন, তারপর দেশলাইয়ের কাঠিও ছুঁইয়ে দিল। জ্ব'লে-জ্ব'লে পুড়ে মরব, চেঁচাব, কেউ শুনবে না, কেননা ওরা হয়তো তখন বাইরে থেকে শিকল টেনে দিয়ে দূরে স'রে গিয়েছে। জ্ব'লে-জ্ব'লে পুড়ব আমি, গায়ে ফুলকো-ফুলকো ফোসকা পড়বে, ফুলকি উড়বে, চর্বি বেরিয়ে গিয়ে সমস্ত শরীরটাই একটা দগদগে ঘায়ের মতো হবে, জ্ব'লে-জ্ব'লে আমি একসময় থেমে যাব, সেও ভালো, অহর্নিশি এখন যে ভিতরে-ভিতরে জ্বলছি, তার চেয়ে সব ভালো।

মারবে, ওরা আমাকে মারবেই। জেগে ঘুমিয়ে আমি সর্বদা ওদের ফিসফিস শুনি, ওদের চোখে চক্রান্তের কালো ছায়া দেখতে পাই। শিউরে উঠি, আমার ঘুম গিয়েছে, আমার খাওয়া ঘুচেছে, সুখ আর শান্তি চিরদিনের মতো ফুরিয়েছে।

স্বামীর পাশে শুতে পারি না, দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠি। আজ ক'দিন হ'ল পাশের ঘরে বিছানা পেতে শুচ্ছি। আমার স্বামীকে বলেছি,

ও-ঘরে বড়ো গরম, তাই এ-ঘরই ভালো, ঠাণ্ডা মেজেই ভালো। তবু ঘুম আসে কই? মাঝে-মাঝে জেগে উঠি, মনে হয় পাশের ঘরে কাদের যেন কথা শুনছি। ফিসফিস, ফিসফিস, কথা আর ফুরোয় না, ঝাউগাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে যেন একটা নিরন্তর হাওয়ার ঝড় বইছে।

আমি জানি এ-ফিসফিস কিসের। প্রীতিলতা এসেছিল, ও-ঘর ছেড়ে আসা, ওদের এভাবে স্থযোগ দেওয়া উচিত হয়নি। আস্তে-আস্তে উঠে যাই, কান পাতি দেয়ালে। ওদের কথা শুনতে চেষ্টা করি। কবে, আমার মৃত্যুদিন কবে ওরা স্থির করেছে? এই পূর্ণিমায়, আসছে একাদশীতে, না অমাবস্যায়? খুনীরাও কি পঞ্জিকা দেখে? শুভদিনের মতো পাঁজিতে বুঝি একটা অশুভ দিনের নির্ঘণ্টও আছে।

যেদিন জেগে উঠে পাশের ঘরে সাড়াশব্দ শুনি না, সেদিন ভয় পাই আরো। আমার শরীরটা কাঠ হ'য়ে ওঠে। নাড়ি চলে না, চোখের পলক পড়ে না। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখি একটা কালো ছায়া ঢালু জমিতে জলের ধারার মতো নিঃশব্দে আমার দিকে গড়িয়ে আসছে। এ যে আমার চোখের ভ্রম, এ-কথা টের পেতে সময় লাগে। ওই ছায়াটা আসলে তো জানলার বাইরে যে-নিমগাছটা আছে, তারই ছায়া, সে আমাকে ধরতে আসবে কেন! ভয়ে-ভয়ে চেয়ে দেখি দরজার দিকে। না, ভালো ক'রে খিল এঁটে শুয়েছিলুম, খিলটা তোলাই আছে।

মরব, আমি মরবই, ওরা যদি আমাকে নাও মারে, তবু না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, ভয়ে আমি মরব।

সেদিন সন্ধে হয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি চুল বাঁধছিলাম। হঠাৎ কাঁধের উপর কে যেন একখানা হাত রাখল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো আমি চমকে উঠলুম, চিৎকার ক'রে উঠলুম তীব্র স্বরে।

অথচ সেই হাত আমার স্বামীর।

ওর কাঁধে মাথা রেখে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললুম, 'তুমি এত ভয় দেখাতেও পারো।'

ও বলল, 'কাঁধে হাত রাখলুম, সেটা ভয় দেখানো হ'ল?'

'বা রে, ভয় দেখানো নয়?'

ও শুধু বলল, 'পাগল।'

একদিন তিক্ত গলায় বলেছিলুম, 'পাগল হ'লে তোমাদের স্থবিধে হয় জানি, কিন্তু পাগল আমি হব না। থাকব, বাঁচব, তোমাদের পাহারা দেব, বাধা দেব।'

'বাধা কিসের?'

বললাম, 'ন্যাকা, কিছু জানো না?'

ও বলল, 'বেশি বাজে বোকো না।' ওর গলা শুকনো, কিন্তু চোখে লিকলিকে ঘৃণা আমি দেখতে পেয়েছিলুম।

খেতে ব'সেও খুঁটে-খুঁটে ভাত খাই আর ছড়াই। আমার স্বামী দেখতে পেলে অবাক হ'য়ে বলে, 'কী হ'ল?'

মুখে কিছু বলি না, কিংবা হয়তো বলি, 'এমনি। অরুচি হয়েছে। কিছু ভালো লাগছে না।'

আবার মনে-মনে নিজেকে এও বলি, তুমি পাগল, একটা আস্ত পাগল। ভাতে বিষ থাকলে কি টিপে দেখলে টের পাওয়া যায়? চোখে দেখে বোঝা যায় না, চেখে দেখলেও না। কোনো-কোনো বিষের ক্রিয়া অনেক পরে শুরু হয়। সাপের ছোবলের মতো সব বিষেই কি মানুষ মুহূর্তে ঢোলে আর নেতিয়ে পড়ে?

আর বিষ মেশাবেই বা কী ক'রে? রাঁধছি তো আমি, বেড়েও দিচ্ছি আমি। তবু যদি অগোচরে বিষ মেশায় তবে সেই বিষে ও মরবে না? নিজের জন্য আলাদা খাবার ও পাচ্ছে কোথায়?

তবু সাবধানের মার নেই, মাঝে-মাঝে ভাবি, ভাত বেড়ে নিয়ে তু-তু ক'রে পোষা কুকুরটাকে আগে ডাকব। কুকুরটা ওর বড়ো প্রিয়, মরে যদি সেই আগে মরুক।

জানি মরব, আমার নিষ্কৃতি নেই, কিন্তু এত সহজে ওদের চক্রান্ত সফল হ'তে দেব না।

কবে প্রীতিলতা আর আমার স্বামীর সম্পর্কের রহস্যটা আমার চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল? সেটা আমার নিজেরও মনে নেই।

আসলে সন্দেহ আমি তো করতাম গোড়া থেকেই। তবে ওদের কিছু বুঝতে দিইনি।

সন্দেহ গোড়া থেকেই করতাম— লোকে বলবে আমার মন ছোটো। তা ঠিক জিনিস ধরবার ক্ষমতার নাম যদি ছোটো মন হয়, তবে আমার তাই ভালো।

শাস্তি আমি পাইনি সত্যি, কিন্তু আমার সান্ত্বনা এইটুকু যে আমি ঠকিওনি।

ঠকিনি কিন্তু ঠকিয়েছি। ওদের বুঝতেই দিইনি যে, আমি বুঝেছি।

আমার মনে আছে, প্রীতিলতা যেদিন প্রথম আমাকে দেখতে এল।

গোড়ালিতে খুটখুট শব্দ ক'রে একটি মেয়ে তরতর ক'রে, অনায়াস ছন্দে উপরে উঠল— প্রীতিলতাকে সেই আমি প্রথম দেখি।

লম্বা, রোগা মেয়েটি আমার পাশে বসল, ব'সেই গলা জড়িয়ে ধরল আমার, মাথাটাকে টেনে একেবারে বুকের ওপর ফেলল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলুম, কিন্তু পারলুম না। মেয়েটা রোগা হ'লে কী হয়, দেখলুম ওর সঙ্গে গায়ের জোরে আমি পারব না।

আমার পাশে ব'সেই আমার হাত দুখানা টিপে-টিপে পরখ করল। বলল, 'বাঃ, বেশ নরম তো!'

আমি তখনও ওর পরিচয় পাইনি, নামও জানি না। মনে-মনে বললুম, নরম হবে না তো সবাই তোমার মতো হাড়গিলে হবে নাকি।

আমিও আড়চোখে ওকে লক্ষ্য করছিলুম। লিকলিকে হাতে দু-গাছা মোটে বালা পরেছে মেয়েটা, আর হাতঘড়ি অবশ্য একটা আছে, কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা। গালের হাড় দুটো উঁচু— সমস্ত মুখে আর দেহছন্দে শ্রীহীনতা আপনা থেকেই চোখে পড়ে, খুঁটিয়ে দেখতে হয় না। সম্বলের মধ্যে আছে কালো চোখ— ও-দুটি না থাকলে ওকে মেয়ে ব'লে চালানোই শক্ত হ'ত— কেননা, গোল-গোল ফোলা-ফোলা ভাব, আমরা যাকে মেয়েলি ছাঁদ বলি, তা এই মেয়েটির শরীরে কোথাও নেই। ওর বুকেও ঔদ্ধত্য নেই, ঔদ্ধত্য যা আছে তা ওর ধারালো নাকে আর খুব সহজ সপ্রতিভভাবে চাইবার ভঙ্গিতে, যাকে আমার নববধূ-চোখে সেদিন নির্লজ্জতা ব'লেই মনে হয়েছিল। প্রথমে পাউডার যখন ছিল, তখন ভেবেছিলুম, মেয়েটি ফিকে ফর্সা, পরে পাউডার ঝরল, তখন দেখলুম, তা তো নয়, আসলে ও ময়লাই, একমেটে ক'রে চেহারায় যা-একটু চেকনাই আনতে চেয়েছে। তবু তো শুকনো ব্রণের দাগগুলো ঢাকতে পারেনি।

আমি একাই যে ওকে এতটা হিসাব ক'রে-ক'রে দেখছিলুম, তা নয়, ও-ও আমাকে দেখছিল। ব্যাপারটা কী, আমরা, মেয়েরা, এসব কাজ তেমন সচেতনভাবে করি না, নিজেদের জাতের রূপের খুঁত-টুতগুলো আপনা থেকেই আমাদের চোখে প'ড়ে যায়। একটা বেড়াল আর-একটা বেড়ালকে দেখলেই রোঁয়া ফুলিয়ে সরোষে ডেকে ওঠে। ডাকি আমরাও, মেয়েরাও। তবে মনে-মনে। আর-একটি মেয়ের কাছাকাছি এলে ভিতরে-ভিতরে আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা আপনা থেকেই গ'ড়ে ওঠে। পথে

অপরিচিত আগন্তুক দেখলেই পাহারাদার সান্ত্রীর হাত তার সঙিন স্পর্শ করে ব'লে শুনেছি। আমরা, সন্দেহ যাদের সহজাত, আমরাও তাই।

প্রীতিলতা বলল, 'তুমি ভাই দেখতে ভারি সুন্দর।' ব'লেই আমার গাল টিপে দিল।

আমি লজ্জায় লাল হ'য়ে গেলুম। বললুম, 'ছাই। সুন্দর তো আপনিও।'

ও হেসে উঠল। বলল, 'তুমি ভাই শুধু দেখতেই সুন্দর নও, সুন্দর ক'রে মিছে কথাও বলতে পারো।'

আরও কতরকম ক'রে সেদিন যে প্রীতিলতা আমাকে নাড়াচাড়া করছিল! যদিও মেয়ে, তবু আমি অস্বস্তি বোধ করছিলুম, আমার বিশ্রী লাগছিল। আমাকে ও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলই কতরকম ক'রে। তারপর যেন রায় দিচ্ছে, এমন স্বরে বলল, 'নাঃ, স্বীকার করতেই হয়, রতিদার পছন্দ আছে।'

রতিদা? আমার স্বামী কি ওর দাদা?

ও বলল, 'দাদাই তো। তবে অনেক দূর-সম্পর্কে। তোমাদের বিয়েয় আসতে পারিনি ভাই, ক'দিনের জন্য বাইরে গেছলুম। আজ ফিরেই চ'লে এলাম। আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান—কবিতায় পড়োনি?'

আমি বললুম, 'কী যা-তা বলছেন!'

'রতিদাকে আর দোষ দেব কী, আমার নিজেরই যে তোমার প্রেমে প'ড়ে যেতে ইচ্ছে করছে,' বলতে-বলতে ও করল কী, ঝুঁকে প'ড়ে আমার গালে একটা চুমু খেল।

আমি ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠলুম। আঁচল দিয়ে গাল ঘষতে-ঘষতে বললুম, 'আপনি ভারি অসভ্য।'

প্রীতি খর-চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিল। সেই অপলক দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারিনি। মাথা নিচু করেছিলুম।

ওকে বলতে শুনলুম, 'কেন মেয়েমানুষের বুঝি মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে নেই?'

জড়িত গলায় আমতা-আমতা ক'রে বললুম, 'থাকবে না কেন, তবে— তবে— '

'তার রকম আলাদা, এই বলবে তো?' প্রীতি আবার হেসে উঠল, 'তা ভাই, আমি মানুষটাও একটু আলাদা রকমের।'

প্রীতি উঠে পড়েছিল। আমার কোলে গুঁজে দিয়েছিল একটা নেকলেসের বাক্স— 'চললুম।'

'উনি এলে কী বলব?'

'বোলো— বোলো যে প্রীতি এসেছিল।'

শাড়ির ভাঁজ টেনে-টেনে মসৃণ করল প্রীতি, হাত-ব্যাগের আয়না দেখে চুল ঠিক করল, ঘাড় ফিরিয়ে বাঁধল জুতোর স্ট্র্যাপ, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

আমার স্বামী বাড়ি ফিরতেই জিজ্ঞাসা করলুম, 'প্রীতি কে?'

ও বলল, 'কেন, এসেছিল নাকি?'

বললুম, 'হ্যাঁ। কেমন একটু অদ্ভুত যেন, না?'

'অদ্ভুত কী দেখলে?'

'একটু যেন গায়ে-পড়া স্বভাব। বিশ্রী-বিশ্রী যা-সব কাণ্ড করছিল!' তবু তো লজ্জায় মুখ ফুটে ওকে বলতেই পারলুম না প্রীতি যা-যা করেছিল। শুধু বললুম, 'বলছিল, মেয়েতে-মেয়েতে নাকি ভালোবাসা হয়। সত্যি হয়?'

ও জবাব দিল না। হাসতেই থাকল। শেষে বলল, 'প্রীতি সত্যিই একটু আলাদা ধরনের মেয়ে। তা ছাড়া বড়ো দুঃখী। কম বয়সে বিধবা হয়েছিল, ভালোবাসা কাকে বলে, তার স্বাদ পায়নি। তাই মাঝে-মাঝে একটু বাড়াবাড়ি করে। তুমি কিছু মনে কোরো না, বরং পারলে ওকেও একটু ভালোবাসা দিয়ো। পারবে না ?'

আমি বোকার মতো বললুম, 'কোথা থেকে দেব ?'

আমার স্বামী বলল, 'কেন, আমার ভাগ থেকে।'

রাগ ক'রে বললুম, 'আমার কাছে ভাগ-টাগ নেই, সবই তোমার। ভাগ দিতে হয়, তুমি দিয়ো।'

ও বলল, 'বেশ।'

তখন কি জানি, কথাটা ও বলল অন্য অর্থে ?

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সেদিন আমার স্বামীর কাছ থেকে প্রীতির বিষয়ে নানা খবর জেনে নিয়েছিলুম। কম বয়সে বিধবা হ'য়ে প্রীতি নার্সিং পড়ে। এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। ধাইগিরিও শিখে নিয়েছে। সংসারে আর নেই কেউ বুড়ি এক মা ছাড়া— দূর-সম্পর্কে যিনি আমার মাসশাশুড়ী।

প্রীতি পরদিনই এল, সকালবেলা। মাথায় শাদা পালের মতো কড়কড়ে রুমাল বাঁধা, নইলে কালকের সাজের সঙ্গে আজকের সাজের কোনো তফাৎ নেই।

আমার স্বামী বাড়িতেই ছিলেন।

হেঁট হ'য়ে পায়ের জুতো খুলল প্রীতি। তারপর সোজা ঘরে ঢুকে টানটান হ'য়ে আমার স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাল চুরি ক'রে তোমার বউ দেখে গিয়েছি, রতিদা।'

ও বলল, 'তাই নাকি।'

প্রীতি বসল একটা মোড়া টেনে, আমার স্বামীর কাছেই। ও ইজি-চেয়ারে শুয়ে কাগজ পড়ছিল। আমার দিকে চেয়ে প্রীতি বলল, 'একটু চা খাওয়াও ভাই। কাল সারারাত পা টিপতে-টিপতেই গেছে।'

বললুম, 'কার পা টিপলে?'

প্রীতি বলল, 'আর বোলো না, এক রুগীর। অর্থাৎ পর-পুরুষের। তোমাদের মতো সাবিত্রীর কপাল নিয়ে তো আসিনি ভাই, পর-পুরুষের সেবা করতে-করতেই জন্ম গেল!'

আরও কত কী ছাইভস্ম বলল প্রীতি তার ঠিক নেই, আমার স্বামীই ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল— 'আঃ, প্রীতি, কী বাজে বকছ!' আমার দিকে চেয়ে, যেন প্রীতির হ'য়েই খানিকটা ওকালতি করবার সুরে বলল, 'প্রীতি নার্স কিনা, তাই নিজের প্রফেসন নিয়েই ঠাট্টা করছে।'

আমি চা ক'রে আনতে গেলুম।

ফিরে আসতে আমার বোধ হয় মিনিট দশেক লেগে থাকবে। শুনলুম:

'বউ কত দূর লেখাপড়া শিখেছে?' প্রীতির গলা।

'ম্যাট্রিক পাস।' এ-গলা আমার স্বামীর।

'আমি ওকে পড়াব।'

ততক্ষণে কাপ নিয়ে আমি ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম।

আমাকে লক্ষ্য ক'রে প্রীতি বলল, 'রতিদাকে বলছিলুম ভাই বউদি, তোমাকে পড়াব। আমাকে দিদিমণি করতে আপত্তি নেই তো? বলো, রাজী?'

এই রাজী হওয়াই আমার কাল হবে, তখন বুঝতে পারিনি।

ওই এক চালেই প্রীতি আমাকে মাৎ করেছিল।

আমার মনে ওর সম্পর্কে যে-বিরাগ জমেছিল, বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখলুম, তা অহেতুক। প্রীতি তো আমার ভালোই চায়। নইলে হাড়ভাঙা

খাটুনির পর কে আবার সেধে পরের বউকে লেখাপড়া শেখাবার ভার কাঁধে নেয়।

তখন কি টের পেয়েছি যে, প্রীতি আসলে নিত্য এই বাড়ি আসবার একটা ছুতোই খুঁজছিল?

প্রীতি, আজ তোমাকে জনান্তিকে বলি, নার্স না হ'য়ে তুমি যদি অভিনেত্রী হ'তে, ঢের বেশি নাম করতে পারতে।

গোড়াতে খানিকটা সন্দিগ্ধ হ'লেও পরে আমি অসতর্ক হ'য়ে পড়েছিলুম।

প্রীতি আসতে শুরু করল। যেদিনই ফুরসৎ পেত, সেদিনই আসত। আসত ওর কাজের রুটিনে সামান্য একটু ফাঁক পেলেই।

ওকে নিপুণা অভিনেত্রী বলেছি কেন? বলেছি এই কারণে যে, প্রীতি সুকৌশলে আমার চোখে ধুলো দিয়েছিল।

ও যদি বেছে-বেছে এমন সময় আসত, যখন আমার স্বামী বাড়ি থাকে, তা হ'লে আমার সন্দেহ আরও তাড়াতাড়ি আসত।

কিন্তু তা তো নয়। প্রীতি বরং বেছে-বেছে আসত এমন সব সময়েই যখন আমার স্বামীর বাড়িতে থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

চৌকাঠে দাঁড়াত, ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করত, 'আছে, না চ'লে গেছে?'

আমি হেসে বলতাম, 'গেছে।'

আর প্রীতিও তখন হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকত। আদর করত আমার থুতনি ছুঁয়ে। কোনোদিন বা আমার কোলেই মাথা রেখে শুয়ে পড়ত। আমি শিউরে উঠতাম। মুখ বুঁজে থাকতাম কখনও-কখনও। কখনও বা ওকে দু-হাত দিয়ে ঠেলে দিতে-দিতে বলতাম, 'সরো, সরো।'

ও সরত না। বরং ওর লিকলিকে রোগা হাত দিয়ে আমার কোমর আরও শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরত। বলত, 'রতিদা বাড়ি নেই, তুমি একলা, এই তো সুযোগ। কবিতায় পড়োনি— আজ শুধু কূজন-গুঞ্জন, তোমাতে আমাতে শুধু নীরব ভুঞ্জন ?' প্রীতিলতা গান গাইত না, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে একটা গাঢ় তীব্রতা ছিল। কবিতা চমৎকার আবৃত্তি করতে পারত।

আমি বলতাম, 'তুমি একটা পাগল। নাও, এবার সরো।'

ও তবু সরত না, নড়ত না, ছাড়ত না। হাসতে-হাসতেই বলত, 'পাষাণি, তোমার হৃদে কি এতটুকু মায়া-দয়া নেই ? এই খেটেখুটে এলুম, এখনও হাঁপাচ্ছি, কোথায় একটু হাওয়া করবে, মাথা টিপে দেবে, তা তো নয়, কেবলই তাড়াচ্ছ, আর দূরে ঠেলছ।'

সত্যিই ও হাঁপাত। এমনিতেই ও রোগা, কণ্ঠার হাড় তখন যেন ঠেলে-ঠেলে আরও উঁচু হ'য়ে উঠত। মিনতি ক'রে প্রীতি বলত, 'একটু হাত বুলিয়ে দেবে ? দাও না! বয়স হয়েছে তো, আজকাল অল্পতেই হাঁপিয়ে পড়ি।'

আমি হেসে বলতাম, 'বয়স কত তোমার ? ষাট না সত্তর ?'

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে প্রীতি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত, সখেদে বলত, 'তা হবে বৈকি, ওরই মাঝামাঝি একটা-কিছু। মেঘে-মেঘে কম কি বেলা হ'ল ?'

আশ্চর্য, ওর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যাতে এমন একটা অসম্ভব কথাও সত্য ব'লে মনে হ'ত— আমি কেঁপে উঠতাম। ওর চোখের দিকে চেয়ে সত্যিই মনে হ'ত, এই মেয়েটির বুঝি বয়স নেই, সে-কালের ডাইনিদের মতো। বাইশ বা বত্রিশ ও যা খুশি হ'তে পারে। আমার ভয় করত। এই সর্বনাশী খ্যাপাটে মেয়েটা কি আমাকে পাকে-পাকে জড়াবে, গ্রাস করবে ? ও কি অজগর ?

একদিন ও বলল, 'আচ্ছা, ধরো তোমার স্বামী যদি এখন হঠাৎ এসে পড়ে ?'

আমি বললুম, 'এলেই বা, আমরা অন্যায় তো কিছু করছি না!'

আমার কোলে প্রীতির মাথা ছিল। গরম হাওয়ার ভয়ে দরজা ভেজানো ছিল। ধড়মড় ক'রে উঠে বসল প্রীতি। স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কাকে ন্যায়-অন্যায় বলো ?'

আবহাওয়া হালকা ক'রে দেওয়ার জন্য আমি বললুম, 'তোমার সঙ্গে তর্ক করবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। এইটুকু জানি আমরা যা করছি, এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। আসলে তো এটা একটা মজা আর ফাঁকি!'

প্রীতি ব্যথিত চোখে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে ছিল, ক্রমে সেই চোখের দৃষ্টি প্রখর হ'ল। একবার আমার হাত চেপে ধরল ও। আমার লাগছিল। ছাড়িয়ে নিতে গেলুম, পারলুম না। আমার চেয়ে প্রীতি তো অনেক রোগা, তবু এত জোর ওর আসে কোথা থেকে ? পরে ভেবে দেখেছি, জোরটা হয়তো ওর গায়ে নয়, মনে। মনের জোর দিয়ে প্রীতি আমাকে বশীভূত করেছিল। ওর কাছে এলে আমি অবসন্ন হ'য়ে উঠতুম। এই ময়লা রোগা মেয়েটার মধ্যে বজ্রের মতো ব্যক্তিত্ব ছিল। ওর চাহনিতে, চলাফেরার চাঞ্চল্যে আর ভঙ্গিতে একটা জ্বালাও ছিল। সেই জ্বালা বিচ্ছুরিত হ'ত। মাঝে-মাঝে এ-কথাও ভেবেছি যে, একটা অতৃপ্ত দাহ প্রীতি অনুক্ষণ বহন করছে। তা দিয়ে অন্য কাউকে পোড়াবার শক্তি ওর নেই, পুড়ছে ও নিজেই।

আমি করুণা বোধ করেছি। এবং আগেই বলেছি এই করুণাই আমার কাল হয়েছিল।

আহত গলায় প্রীতি যখন বলত, 'জানি, জানি, তোমার কাছে সবই মজা, সবই ফাঁকি,' তখন কি জানি কেন, ওর বেদনা আমাকেও স্পর্শ

করত। আমার যুক্তি বুদ্ধি অনুভূতি বলত, এ ঠিক না, এ ভালো না, আমার প্রতি প্রীতির এই আকর্ষণ স্বাভাবিক না, কিন্তু তবু ওর চোখ দিয়ে মাঝে-মাঝে ব্যাপারটাকে বুঝতে চাইতাম। কম বয়সে বিধবা হয়েছে, আহা, জীবনে ভালোবাসা বলতে ছিটেফোঁটাও পায়নি। নিজের চেষ্টায় বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে বটে, তবু ওর চিত্তের মস্ত বড়ো খানিকটা জায়গা ফাঁকাই র'য়ে গিয়েছে। অস্বাভাবিক আসক্তি, দৃষ্টি-ভঙ্গির বিকৃতি প্রীতির তো আসবেই।

আমি ধ'রেই নিয়েছিলুম আমার টানেই ও আসে। এসেই পাগলামি শুরু ক'রে দেয়। ঘোমটা খোলে, খোঁপা ভেঙে দেয়, গায়ের আঁচল নিয়েও টানাটানি করে। আমি বলি, 'ছাড়ো, ছাড়ো, আজ ছ' পাতা টাস্ক করেছি দেখবে না ?' ও খাতা-টাতা সব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, বলে, 'তার চেয়ে এসো তোমাকে সাজিয়ে দিই।' আমার সমস্ত শরীর শিরশির ক'রে উঠত, তবু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতুম। ভাবতুম, আমি তো ওকে কিছু দিচ্ছি না, না দিলেও ও যদি কিছু পায় তবে আমার ক্ষতি কী ?

আমার স্বামীকে বললেও দেখেছি তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। ঈর্ষার চিহ্নমাত্রও ওঁর মধ্যে দেখিনি। ঈর্ষা হবেই বা কেন ! প্রীতি আর আমার সম্পর্ক তো সত্য বা স্বাভাবিক কিছু নয়।

উনি বলতেন, 'হয়, হয়। অতৃপ্ত মেয়েদের এরকম রুচিবিকৃতি হয়।'

তবু খুন চাপা থাকে না। লাশ গুম করাও সহজ নয়। তার অস্তিত্ব একদিন গন্ধে-গন্ধে ছড়িয়ে পড়েই।

আমার চোখে ধুলো দেবার জন্যই ওরা যে চক্রান্ত করেছিল, প্রীতি তার একঘেয়ে একতরফা ভালোবাসার অভিনয় ক'রে চলেছিল, সেটা আমি কবে টের পেলাম ? বোধ হয় আরও মাস পাঁচ-ছয় পরে।

আমি একদিন ওদের অসতর্ক অবস্থায় দেখে ফেললাম। প্রীতির কাঁধে একটা হাত রেখে আমার স্বামী বলছিল, 'তুমি জানো আজ আমি বাড়ি থাকব, আজ এলে কেন ?'

প্রীতিকে বলতে শুনলাম, 'বেশ করেছি। একটা খুকির সঙ্গে ন্যাকামি ক'রে-ক'রে ঘেন্না ধ'রে গেল। ঘোল খেয়ে-খেয়ে পেট ভরিয়েছি, আজ দুধের স্বাদটা মিটিয়ে নিই।'

আমার স্বামী বলছিল, 'ও যখন নিচে গেল তুমিও সঙ্গে গেলে না কেন। আমরা দু-জন একলা ঘরে— ও কী ভাববে বলো তো ?'

প্রীতি বলল, 'কিছু ভাববে না। বৃথাই কি তবে এতদিন ওর সঙ্গে মিশেছি। ছলা-কলা আর মিছে কথা দিয়ে ওর সব ভাবনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।' বলতে-বলতে প্রীতির স্বর গাঢ় হ'য়ে এল। দু-হাত দিয়ে আমার স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল, 'এসো।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই কে যেন আমাকে ভিতর থেকে ব'লে দিল, 'আর দেরি নয়, এখুনি ঢুকে পড়ো।' তার কথামতো কাজ করলুম। আমাকে দেখে ছিটকে দু-দিকে স'রে গেল দু-জনে, যেন একটা টান-টান ধনুকের ছিলা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল।

ওরা আমার দিকে চেয়ে ছিল নির্নিমেষ, ক্রুদ্ধ, বিব্রত চোখে। চোখ যদি নখ হ'ত, তবে আঁচড়ে-আঁচড়ে আমার দেহ বেয়ে তখন রক্তের ধারা নামত। রক্তের ধারা বইছিল আমার অন্তরে— কিন্তু ওদের আমি তা বুঝতে দিলুম না।

মনে-মনে বলছিলুম, কেমন জব্দ, কেমন জব্দ, পিপাসার জলের গ্লাস ঠোঁটের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলুম তো। আমার স্বামী ভেবেছিল আমি কিছু দেখতে পাইনি। সে উৎকণ্ঠিতভাবে বলল, 'তোমাকে যেন কেমন শুকনো-শুকনো দেখছি ? অসুখ করেনি তো ?'

প্রীতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। অতি মমতা-মৃদু গলায় বলল, 'শরীর খারাপ তো গা ধুয়ে এলে কেন? দেখি, তোমার হাত দেখি।' ব'লেই প্রীতি আমার কবজি ধরল। আমি টের পেলাম, নাড়ি দেখবে কী, ওর নিজেরই হাতের আঙুল কাঁপছে। আর প্রীতি নাড়ি দেখছেও না তো। হাত ছুঁয়ে আমার মন পরীক্ষা করতে চাইছে।

আমি সেদিন ওদের কিছু বুঝতে দিলুম না। আমরা তিনজনে একটা ছোটো টেবিলের পাশে গোল হ'য়ে বসলুম, কত গল্প করলুম চা খেতে-খেতে। মনে তীব্র ঘৃণা নিয়েও কত যে ঢলঢল হাসি হাসা যায়, কত যে মস্করা করা যায়, সেদিন আমি তার প্রথম নমুনা দেখলাম।

ওদের দু-জনের চোখেই তো ঘৃণার ফুলকি দেখেছি।

সেদিন রাত্রে আমার স্বামী আমাকে আদর করেছিল। সেই আদর আমি নিয়েছি, সয়েছি। সামান্যবুদ্ধি রমণী আমি মনে-মনে আমার ইতি-কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছিলুম। বাড়াবাড়ি করব না, হৈচৈও নয়। যেন কিছুই দেখিনি, যদি বা দেখেছি, বুঝিনি। এ-বাড়িতে আসার ছল খুঁজবে ব'লে প্রীতি অভিনয় করতে পারে, আর আমি পারিনে। ওরা ডালে-ডালে আছে, আমি থাকব পাতায়-পাতায়।

আমার স্বামী আমাকে চুমু খেল। সেই চুমু আমিও ফিরিয়ে দিলুম। পারছিলুম না, আমার ঠোঁট খোলা হাওয়ায় ফেলে-রাখা কমলালেবুর কোয়ার মতো শিটিয়ে উঠছিল, তবু পারতে হ'ল। ওদের টের পেতে দেব না আমি।

আসলে আমি কি ভয় পেয়েছিলুম? আমি সব জেনেছি, জানলে পাছে ওরা অন্য কোনো ফন্দি বার করে সেই আশঙ্কাতেই হয়তো আমি কিছু না-বোঝার মুখোশ এঁটে নিয়েছিলুম। আমি হয়তো আমার অগোচরে ওদের কাছে সকাতরে প্রাণভিক্ষাই চেয়েছি। বলব

না, তোমাদের আমি কিছু বলব না, শুধু আমাকে প্রাণে মেরো না।

তাতেও পার পেলাম কি! ওরা ক্রমেই হিংস্র ক্ষিপ্ত ধৈর্যহীন হ'য়ে উঠছিল। যতক্ষণ আড়াল ছিল ততক্ষণ আমাকে সহ্য করতে ওদের বাধেনি। সেই আড়ালটুকু হাওয়ায় যেই স'রে গেল অমনি ওরা বিদ্বেষে অন্ধ হ'য়ে উঠল। হয়তো ভাবল, আপদটা দূর হ'লে বাঁচি। বাইরে ভালোমানুষির ঠাট তবুও বেশ কিছুদিন বজায় ছিল।

আমার স্বামী যখন আমাকে কাছে ডেকে নিতেন তখন এমন সব দুষ্টুমির স্বাদ জাগত মনে। দ্বিতীয় ভাগের একটি ছেলে তার মাসির কান কামড়ে দিয়েছিল না! ভাবতুম আমিও তেমনি একটা কিছু করব। ওকে রক্তাক্ত করি, দূরে ঠেলে দিই, জিজ্ঞাসা করি কঠিন গলায়, 'মনে যদি এই ছিল তবে তুমি প্রীতিকে বিয়ে করলে না কেন?' জানি ও একটা কৈফিয়ৎ দিত। হয়তো বলত, 'অসুবিধা ছিল, সামাজিক বাধাও— প্রীতি বিধবা!' আমি বলতাম, 'ওটা এ-কালে একটা বাধাই নয়, আর যত বাধাই থাক আমাকে এইভাবে জড়ানোর জ্বালানোর ঠকানোর কোনো মানেই হয় না।'

এসব কথা আমি সত্যিই কিন্তু কোনোদিন তুলিনি। তুললে যে-আড়ালটা ছিল সেটাও খুলে যেত যে। ওই আড়ালটুকুই তো আমার আত্মরক্ষার উপায়, আমার আবরণ। ভীত লজ্জাতুর রমণীর মতো আমি যেন আমার শেষ বস্ত্রের টুকরোটি আঁকড়ে ধ'রে আছি।

ওরাও ধীরে-ধীরে সহজ হ'য়ে আসছিল।

আমার মনে আছে যেদিন দুপুরে প্রীতি ঘরে ঢুকে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল, অস্থির ক'রে তুলল একেবারে আগেকার মতো আদরে-আদরে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'জানো, আমি এই বাড়িতেই উঠে আসছি।'

আমার মুখ দিয়ে আর্তস্বর বেরিয়ে পড়ল, 'এই বাড়িতে ?'

'হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতে, তিনতলার ঘর দুখানা খালি হচ্ছে শোনোনি ? ভালোই হবে, আমরা সকলে একসঙ্গে থাকব।'

'ভালোই হবে!' আমি শুষ্কস্বরে প্রতিধ্বনি করলুম।

গলায় তেমন আন্তরিকতা ফুটল না। সেটা প্রীতিরও কানে ধরা প'ড়ে থাকবে, তাই সে আমায় গাল টিপে দিয়ে বলল, 'তা ছাড়া তোমাকে তো আরো ঢের বেশিক্ষণ দেখতে পাব, তাই বা কম লাভ কি!'

আমি বললুম, 'না, কম নয়।'

প্রীতি বলল, 'ঠাট্টা নয় ভাই। আমার মা বুড়ি হয়েছেন, চোখে ভালো দেখতে পান না। বাড়িতে ফেলে রেখে কাজে বেরিয়ে যাই আর সারা-ক্ষণ ভয়ে মরি। এখানে এসে নিশ্চিন্ত। তুমি অন্তত খোঁজ-খবর নিতে পারবে।'

'পারব।' আমি ঘাড় নেড়ে বললুম। কিন্তু ঘাড় নাড়াটাই প্রীতি শুধু দেখতে পেল, কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ হয়েছিল যে আমার নিজের কানেই তা গেল না।

আমার দুঃস্বপ্নের দিন শুরু হ'ল। দুঃস্বপ্নের রাত্রিও।

ওরা লুকোতে চেয়েছে তবু পারেনি, আমার চোখে বারবার ধরা প'ড়ে গেছে, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ওদের চোখে আমি ধুলো দিয়েছি। মাঝে-মাঝে নিষ্ঠুর একটা মজার খেলাও আমি পেয়ে গিয়েছিলুম। যখনই ওরা সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছে তখনই হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লাম, ওদের খেলা ভেঙে দেবার লোভ আমি সামলাতে পারিনি। কখনও বা ঘরে ঢুকিনি, আড়াল থেকে আমার গলার সাড়া বা চঞ্চল চলাফেরার ইশারা দিয়ে ওদের বুঝিয়ে দিয়েছি যে-কোনো মুহূর্তে আমি ঢুকে পড়তে পারি।

আবার এমনও হয়েছে, আমিও ছিলাম ওরাও ছিল; চোখের ভাষায়-ভাষায়, পায়ের আঙুলের ছোঁয়ায়-ছোঁয়ায় ওরা কাছাকাছি আসছিল, আমি টের পেয়েছিলুম তবু নড়ছিলুম না, ওরা ক্রমশ অধীর হ'য়ে উঠছিল, যত অধীর হচ্ছিল ততই আমার মজা লাগছিল, আমি কিছুতে নড়ব না, ঘাঁটি আগলে ব'সে থাকব, দেখি না কী হয়, কতদূর গড়ায়। একটা শারীরিক জ্বালা আর উত্তেজনা টগবগ ক'রে উথলে উঠে ছাপিয়ে পড়ুক, ওদের পুড়িয়ে দিক, ফোসকায়-ফোসকায় ওরা ঝলসে যাক। আমি বসব, ব'সে-ব'সে শুধু দেখব।

কতদিন আমার স্বামী বলেছেন, 'যাও তো, আমার জন্য একটা পান সেজে নিয়ে এসো তো।' আমি উঠিনি, চাকরকে ফরমাশ করেছি। প্রীতি যদি বলেছে, 'ওমা! ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামল, ছাদে কাপড় মেলে দিয়ে এসেছি বোধ হয় তোলা হয়নি, তুমি একবার দেখে এসো তো ভাই,' আমি তখন বোকা-বোকা ধরা-ধরা গলায় বলেছি, 'একদম নড়তে পারছিনে যে ভাই প্রীতিদি, ঝিঁঝিঁ ধ'রে পা দুটো অবশ হ'য়ে গেছে।'

ওরা তখন অক্ষম নিরুপায় চোখে পরস্পরের দিকে চাইত। ওদের যন্ত্রণা হ'ত। সেই যন্ত্রণা আমি দেখতাম।

একদিন রাত্রে ওকে পাশে না দেখতে পেয়ে আমি সোজা তিনতলায় উঠে গিয়েছিলুম। বলিহারি আমার দুঃসাহসকে! প্রীতির ঘরের চৌকাঠের সামনে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি যেতেই আমার স্বামী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, 'প্রীতির মা-র শ্বাসকষ্টটা বড়ো বেড়েছে, ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। আমি যাই।'

রাস্তার গ্যাসের আলো মুখে প'ড়ে ওকে ন্যাবা রুগীর মতো দেখতে লাগছিল। আমার হাসি পাচ্ছিল। আক্রোশে জ্বলছিল প্রীতির চোখ। আমি ভয় পেয়েছিলুম।

তখনই আমি বুঝেছিলুম, রামায়ণের যে-ব্যাধের গল্প প্রীতিই আমাকে একদিন শুনিয়েছিল, তার মতো ক'রে আমি কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে আলাদা ক'রে দিলুম। শান্তি আমি শাশ্বত কালেও পাব না।

সেদিনই, সেই মুহূর্তেই কি চোখের তারায়-তারায় ইশারা ক'রে ওরা আমাকে হত্যা করার মতলব ঠিক করে? হয়তো তাই।

আমাকে এই পৃথিবী থেকে, ওদের দু-জনের মাঝখান থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রটাই প্রীতি এবং আমার স্বামীর প্রথম যৌথ জারজ সন্তান।

### দুই ॥ প্রীতির কথা

রতিদার চোখের দিকে চাইতে আমার এখন ভয় করে। চোখের মণি চিকচিক করছে। বুঝতে পারি রতিদা ভীষণ একটা সংকল্প করেছে। সে-সংকল্প কী যে আমাকে কখনও বলেনি তবু আমি জানি।

মণিকার চোখের দিকে চাইলে আমার মায়া হয়। ভীত, করুণ, ত্রস্ত। রতিদার মনের কথা ও কি বুঝে ফেলেছে? সরল, সুন্দর, নিরীহ মেয়ে, আহা ওর কী দোষ!

মাঝে-মাঝে আমারই অনুতাপ হয়। ভাবি, হাত দুটি জড়িয়ে বলি, 'মনে-মনে যা ঠিক ক'রে রেখেছ কাজে তাকে রূপ দিয়ো না। আমরা এই তো বেশ আছি। একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরও কাছাকাছি না-ই বা এলাম।' জানি, রতিদা শুনবে না, ওর মুখ আরও কালো, ওর চোয়াল আরও কঠিন হবে। গম্ভীর স্বরে বলবে, 'তা হয় না, একবার যখন পাপের পথে নেমেছি, তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে।'

আজও মনে-মনে অবাক হ'য়ে ভাবি, রতিদা কচি একরত্তি ওই মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল কেন। আমার সঙ্গে সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হ'ল অমনি বলা নেই কওয়া নেই মফস্বলের একটা মেয়েকে

সিঁদুর পরিয়ে ঘোমটায় ঘিরে একেবারে ঘরে এনে তুলল। তুললই যদি তবে সেখানেই থামল না কেন। ওই কমবয়সী মেয়েটাকে মেনে নিতে তো পারত।

ভাবি, এই অঘটনের জন্য দায়ী কি আমি? রতিদার মনে না-হয় যা ছিল তা ছিল, আমি কেন লোভ সামলাতে পারলুম না। প্রথম দিন ওকে দেখতে গিয়ে ওই পাখির বাসা ভেঙে দেবার নেশা খুনের মতো চাপল মনে। তারপর থেকে তো শুধুই মিথ্যা, শুধুই ছলা-কলা, অভিনয়। আর সে-অভিনয় এমনই কাঁচা যে ওই বোকা মেয়েটার চোখেও ধরা প'ড়ে গেল। যেতে দেরি হ'ল না। আজ ওকে দোষ দিয়ে লাভ কী।

রতিদাকে এসব কথা বোঝানো যাবে না। সে পুরুষ, অসহিষ্ণু, অধীর। ওদের মনে কোনো ক্ষমা নেই, আপসও নেই।

মনে আছে তো খুব ছেলেবেলায় রেগে গিয়ে আমাকে একটা জানলার শিকের সঙ্গে বেঁধেছিল আর মেরেছিল। সেই নিষ্ঠুর মানুষটা আজও মরেনি।

ওর চরিত্রের আরও একটা বিচিত্র দিক এই যে, হাতে যখন পায় তখন চায় না, হাতছাড়া হ'লেই পশুর মতো খেপে ওঠে। কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ফেরারী আসামীকে খুঁজে আনা হয়, রতিদাও তেমনি ওর মনের কুকুরটার শেকল খুলে দেয়, হারানো জিনিস ফিরিয়ে আনতে। তখন ওর লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, বাছ-বিচার নেই, পাপ-পুণ্য ইহকাল-পরকালের ভয়-ডর নেই।

আমার তো মনে আছে, আমি যেদিন প্রথম ওর কাছে নিজেকে সঁ'পে দিয়েছিলুম। আমার বয়স তখন ভরা আঠারো। ও আমাকে ঠেলে দিল না, কিন্তু নিলও না তেমন ক'রে। অনেকক্ষণ ধ'রে রুদ্ধশ্বাসে আদর করল, আমার এই রোগা লম্বাটে মুখটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া

করল খানিক, তারপর ঠেলে দিয়ে অদ্ভুত ঘোলাটে চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। বিড়বিড় ক'রে যেন নিজেকেই বলল, 'ওঠো। সস্তা, ভারি সস্তা তো।'

ওর সে-কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

আমাকে ও বিয়ে করতে পারত। অল্প একটু সামাজিক বাধা ছিল অবশ্য কিন্তু আজকাল অমন কত কী-ই তো হয়। ওকে বলেছিলাম, 'আমার মাকে একবার বলো।' ও বলত, 'ব্যস্ত কী, সবুর, সবুর। আমি একটা চাকরি পাই—'

চাকরি পেয়েও কিন্তু বলল না। শেষে আমিই একদিন জোর ক'রে ওকে মা-র ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। দরজার বাইরে আমিও কান পেতে ছিলুম। কী জানি, কী বলতে কী ব'লে বসবে।

না, কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলাম ঠিক তেমনটি বলেছিল। ঠিক যেন পাখি-পড়ার মতো মুখস্থ ক'রে। বলার ভঙ্গিতে প্রাণ বা আগ্রহ ছিল না।

বাইরে দাঁড়িয়ে আমার বুক ঢুরঢুর করছিল। না-জানি কী হবে। ও বেরিয়ে এল মাথা নিচু ক'রে। আমি ওকে এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়েছিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী হ'ল?'

ও ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'না, হ'ল না। তোমার মা মত দিলেন না। সগোত্র বিয়ে হয় না।'

আমি জানতাম এই ক্লান্তি ওর ছল, হতাশাটা ভান, আসলে মনে-মনে খুশি হয়েছে। আমাকে সব ব্যাপারে আপন ক'রে নেবার ইচ্ছা ওর নেই, বাধা-নিষেধের সীমানার মধ্যেই পেতে চায়।

মনে পড়ছে আমার বিয়ে যেদিন ঠিক হ'য়ে গেল সেদিন ওর মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া। যারা দেখতে এসেছিল তাদের ও এগিয়ে দিয়ে

এল সদর রাস্তা অবধি। ফিরে এসে বলল, 'জানো, ওদের মধ্যে পাত্র নিজে লুকিয়ে ছিল ?'

আমি তখন দরজার দিকে পিছন ফিরে জবড়জং পোশাকগুলো ছাড়ছি। তাড়াতাড়ি আটপৌরে শাড়িটা নিয়ে নিজেকে ঢেকে বললুম, 'সব কথা পরে শুনছি, তুমি একটু স'রে দাঁড়াও তো।'

ও জিজ্ঞাসা করল, 'কত দূরে ?'

আমিও হালকা গলায় জবাব দিলুম, 'আমার ত্রিসীমানার বাইরে।'

ভেবেছিলুম রতিদা হয়তো রাগ করেছে। হয়তো চ'লেও যাবে। সাত-তাড়াতাড়ি তোয়ালেতে মুখ মুছে বেরিয়ে এসে দেখি তা তো নয়। এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার এক কোণে। আমার পায়ের শব্দে চমকে উঠল। চেয়ে বলল, 'হ'য়ে গেল ?'

বললুম, 'হ্যাঁ। একেবারে। কিন্তু তুমি চ'লে যাওনি ?'

'না। তোমার মুখ থেকে শেষ কথাটা শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

ওর গলা থমথমে গম্ভীর। আমার মনে কী হ'ল এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলুম ওর কাঁধে। বললুম, 'রাগ করেছ ?' আর আশ্চর্য, ওই একটুকু ছোঁয়াতেই ও যেন গ'লে গেল।

একগাল হেসে বলল, 'জানো, ওদের মধ্যে পাত্র নিজেও ছিল।'

মুখে নকল কৌতূহল ফুটিয়ে বললাম, 'তাই নাকি ? কোনজন বলো তো ? যে ভ্যাবা-গঙ্গারামের মতো মাথা নিচু ক'রে ব'সে ছিল, সে ?'

'উঁহু। বড়ো-বড়ো চোখ মেলে যে তোমাকে গিলে খেতে চাইছিল, সে।'

বললুম, 'অসভ্য, কথার যদি কোনো ছিরিছাঁদ থাকে।'

ও বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হ'ল না। তেমনি হাসতে-হাসতে বলল, 'মুখেরই শ্রী নেই কথায় আসবে কী ক'রে বলো ?'

আমি বললুম, 'ঠাট্টা নয়। ঠিক ক'রে বলো তো বর নিজেই এসেছিল? কিন্তু তুমি যার কথা বললে সে তো নেহাৎ নিরীহ গোবেচারী। ওর আবার বিয়ের সাধ কেন?'

রতিদা বলল, 'সে-কথা বিয়ের পর তুমিই ওকে জিজ্ঞাসা কোরো।'

আমার হাতে কিছু ছিল না। আঁচলে বাঁধা ছিল চাবির গোছা। রিং ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারলুম ওর মুখ তাক ক'রে। ঠিক-ঠিক লাগলে কী হ'ত বলা যায় না। লাগল ওর মুখ ফসকে থুতনির ঠিক নিচে।

একাধিক অর্থে আহত হ'য়ে ও ব'লে উঠল, 'বিশ্বাসঘাতিনী।'

আমি বললুম, 'হ'তে পারি কিন্তু তোমার মতো ভীরু নই। তুমি হয় ভীরু, নয় কপট। হয় আমাকে চাও কিন্তু হাত বাড়াবার সাহস নেই, নয়তো চাও না, শুধু অভিনয় করো। অভিনয় তো এতদিন ধ'রেই দেখলুম, রতিদা। বোকার মতো হাততালিও কম দিলুম না। এবার একটু সহজ স্বাভাবিক সাহসী হও।'

ওর চোখ দুটি যেন জ্ব'লে উঠল। তার ভাষার মর্ম আমি গ্রহণ করতে পারলুম না।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওর চোখের জ্বালা যেন নিবে এল। গাঢ় কিন্তু স্পষ্ট গলায় ও বলল, 'প্রীতি, আমি সাহসীও হ'তে পারি। তুমি জানো না আমি মনে-মনে কী দুরন্ত দুঃসাহসী!'

সেই দুঃসাহসীকে ইদানীং ওর চোখে দেখতে পাই। ওর এই রূপ আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আমি যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে মাঝে-মাঝে আসতুম ও তখন প্রায়ই আসত। আমায় একান্তে ডেকে নিয়ে রুদ্ধস্বরে বলত, 'আর নয়, চলো পালিয়ে যাই।'

আমি বলেছি, ‘পালাব ? কোথায় ?’

আসলে আমি ওকে চিনতাম তো। ওর কথায় তাই বেশি গুরুত্ব দিইনি। আমি জানতাম এই খ্যাপামির শেষ কোথায়। আজ ঝোঁকে প'ড়ে ও পালাতে চাইছে সমাজের কাছ থেকে। কিন্তু আমার কাছ থেকেও হয়তো একদিন পালাতে চাইবে। সেদিন ?

ওর অল্পে-ক্লান্ত রূপটি জানা ছিল ব'লেই আমি ওকে শুধু ঠেলেছি আর টেনেছি। রতিদার চরিত্রেও অলক্ষ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছিল সেটা আমি লক্ষ্য করছিলুম। এমনিতে আগের মতোই হাসিখুশি কিন্তু মাঝে-মাঝে ওর মুখে ক্রূর একটা ভঙ্গি ফুটে উঠত। ধৈর্যকে যাঁরা নদী ব'লে কল্পনা করেন, তাঁরা বলবেন, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙত।

আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস ক'রে বলত, ‘প্রীতি, বেরিয়ে এসো।’ আর বুলি নেই, খালি ওই ঘর-ছাড়াবার মন্ত্র।

বিরক্ত হ'য়ে বলেছি, ‘বলছ যে, কিন্তু বেরব কী ক'রে বলো তো ? আমার যে হাত-পা বাঁধা।’

অধীর দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে-থেকে রতিদা মাথা নাড়ত। ওর চোখে ফুটে উঠত উদ্দামতা। মাথা নেড়ে-নেড়েই বলত, ‘আছে, আছে, উপায় আছে।’

আমি বুঝেও না-বোঝার ভান করতাম, নির্বোধের মতো চেয়ে থাকতাম। তখন রতিদার সাহস আরও বাড়ত, ওর ঠোঁট ছুঁইয়ে দিত আমার কানের লতিতে, সুখে-পুলকে-অস্বস্তিতে আমি অবশ হ'য়ে যেতাম, ভাবতাম ছুটে পালাই, কিন্তু পারতাম না।

পাপের একটা সর্বনেশে মোহ আছে যে। সে ভয় যেমন দেখায়, চোখের সামনে তেমনই স্বপ্নের মতো মধুর ছবিও আঁকে।

আমার কানে মুখ ছুঁইয়ে দিয়ে কী বলত রতিদা ?

সে-কথা মুখে উচ্চারণ করা যায় না।

কানেই কি শোনা যায়? আমার নিজের মুখ আমি নিজেই কল্পনা করতাম: ফ্যাকাশে, নীরক্ত, অপলক। কল্‌জের চলায় হয়তো প্রাণের স্পন্দন আছে, কিন্তু দেহ-মনের আর কোথাও সাড়া নেই। সেই কল্‌জেও কে যেন ভিজে স্পঞ্জের মতো মুঠো ক'রে চেপে ধ'রেই ছেড়ে দিত, যন্ত্রণা হ'ত আমার, চোখ বুঁজে ফেলতাম।

কিন্তু চোখ তো শোনে না, শোনে কান। কানের কোনো আগল নেই যে, খিল তুলে দিয়ে শব্দগুলোকে চেতনার দুয়ারের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখব।

তারা ঢুকে পড়তই, ওই ফুসমন্ত্র। প্রথমে পিঁপড়েব মতো নিঃশব্দ পায়ে, কিন্তু একবার যেই তারা ভিতরে পৌছত, অমনই তারা অবাধ, স্বাধীন হ'য়ে যেত। ওদের গলা চড়ত। যারা ছিল পিঁপড়ের মতো নিঃশব্দ, তারাই যেন আমার চৈতন্যের আঙিনায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে মাতামাতি দাপাদাপি শুরু করত। কান ঝাঁঝাঁ করত আমার, আমি বিহ্বল হ'য়ে পড়তাম। ততক্ষণ ওই বিষমুখ কথাগুলো আমার মস্তিষ্কের কোষে-কোষে দংশন করতেও শুরু করেছে।

আমি থরথর ক'রে কাঁপতাম। কানে আঙুল দিয়ে বলতাম, 'ছিঃ।' রতিদার দিকে চেয়ে বলতাম, 'শয়তান, তোমার কথা থামাও।'

রতিদা থামত, কিন্তু আমার উত্তেজনা কমত না। ওর কথায় আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়েছে, সেই কাঁটা পলকে ম'রে যায় কী ক'রে।

রতিদা চ'লে গেলে অবসন্ন শরীর নিয়ে শুয়ে পড়েছি। আমার মগজে তখনও পিঁপড়ের চলাফেরা। ওদের বোবা পা, কিন্তু মুখে বিষ।

ওরা আমাকে তখনও থেকে-থেকে দংশন করত। আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে আপন মনেই আমি বিড়বিড় ক'রে বলতাম, 'দূর হোক এই পাপ-ভাবনা। ওদের আমি মুহূর্তের জন্যেও মনে স্থান দেব না।'

কিন্তু তাই বা নিষ্কৃতি কই। আমার দেহ-মন সব যে ওই শত্রুরা দখল ক'রে নিয়েছে, আমার আত্মরক্ষার উপায় কই।

তবে কি শেষ অবধি আমি আমার স্বামীকেই—

দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে নিজেকেই ধমক দিয়ে বলতাম, 'ছিঃ!'

আমার স্বামীর ছবি চোখের সমুখে ভেসে উঠত। ভালোমানুষ, স্নেহকাঙাল, রুগ্ন, সর্বতোভাবে আমার উপর নির্ভরশীল।

করুণা আমার বুক ছাপিয়ে চোখের জলের ধারা হ'য়ে নামত। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, রতিদার সঙ্গে জীবনে আর দেখা করব না। আমি আর দুর্বল হব না। ওর কোনো কথায় কান দেব না আমি।

আমার স্বামীকে আমি ভালোবাসতেও শুরু করেছিলাম।

প্রাণপণে ওকে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছিলাম।

সারাদিন খেটে-খুটে এসে ও যখন ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়ত, ওকে ঠেলে-ঠেলে জাগিয়ে রাখতাম আমি। বলতাম, 'এই, ঘুমুলে? কথা বলো, কথা বলো, বলো না! আর একটু।'

ও বলত। সারাদিন যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাসে-ট্রামে খিটিমিটি, উপরওয়ালার সঙ্গে মন-কষাকষি, ফেরবার পথে সবজিওয়ালার সঙ্গে বচসা— সব বলত।

শুনতে আমার ভালো লাগত না, তবু ভান করতাম। যেন কতই মজা পাচ্ছি। ও তখন আরও রসিয়ে-রসিয়ে বলত। বলতে-বলতে হাই উঠত ওর, কথা জড়িয়ে যেত, শুনতে-শুনতে আমার।

ওর কথা যখন একেবারে জড়িয়ে যাচ্ছে, চোখের পাতা বুঁজে-বুঁজে আসছে, তখনও নিষ্ঠুরের মতো ওকে খোঁচা দিয়ে বলেছি, 'এই, ঘুমুলে?'

ও জড়িত গলাতেই বলেছে, 'না।' কিন্তু করুণ চোখে আমার দিকে চেয়েছে। সে-চোখের মিনতি আমি পড়তে পেরেছি। ও বলেছে, 'আর

পারছি না, ছুটি দাও, এবার ছুটি দাও আমায়। কাল সকালে তোমাকে আরো গল্প বলব— অনেক, অনেক।'

আমি তবু ওকে ছাড়িনি। আমার তখন চোখে জ্বালা, শরীরে জ্বালা, মনে জ্বালা। বলেছি, 'দিনের বেলা তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় কখন? কতটুকু সময়ের জন্যেই বা তোমাকে পাই?'

শেষে টের পেতাম, ও আর পারছে না। তখন চিমটি কেটেও ফল হ'ত না, ওর নাক-ডাকা শুরু হ'য়ে যেত। আমি শুনতাম।

শুনতাম, আর আরও কাছে স'রে যেতাম।

ওর রোগা বুক ওঠানামা করছে, সেখানে আমার খোঁপাসুদ্ধ মাথা রাখতাম। ওর ঘুমন্ত মনের ভিতরে এখন কী ঘটছে, শুনতে চাইতাম তার ধ্বনি। ও ন'ড়ে উঠত, যেন চমকে উঠে অসহায়ের মতো আরও নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরতে চাইত আমাকে। আমি সাপের ফণার মতো মুখ তুলে ওকে একদৃষ্টে চেয়ে-চেয়ে দেখতাম।

এখন ও অসহায়, এখন সম্পূর্ণভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পিত। আমার সাপের ফণার মতো মাথা দুলত— ইচ্ছে হ'লে এখন আমি ওকে ছোবল—

অসতর্কভাবে নিজেই তীব্র ভীত আর্তস্বরে ব'লে উঠতাম, 'ছিঃ।'

ও ধড়মড় ক'রে জেগে উঠত, দেখতাম ঘামে ওর শরীর ভিজে গেছে। চোখ ঈষৎ রক্তিম। অবাক হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে ও বলত, 'কী? কী হ'ল?'

আমি বলতাম, 'কিছু না। তুমি ঘুমও।'

ও শুয়ে পড়ত ফের, বলত, 'আলো নিবিয়ে দাও। তুমিও ঘুমও।' আমার মাথায় আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিত। আড়চোখে চেয়ে দেখতাম, ও কখন নিঃসাড় হ'য়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার ঘুম আসত না তখনও। ওর বুকে আবার মাথা রাখতাম আমি। অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতাম ওর চোখ, চিবুক, কপাল।

আর সেই অন্ধকারে আবির্ভাব হ'ত রতিদার।

দেখতাম, ওর চোখ ভাঁটার মতো জ্বলছে।

আমি শিউরে উঠেছি। তবু ও আমাকে রেহাই দেয়নি। ওর ছায়া ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে আমার শিয়রে বসেছে। আমি বলেছি, 'করো কী, রতিদা, তুমি এখন যাও। দেখছ না, আমি এখন আমার স্বামীর কাছে শুয়ে আছি। আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমব, রতিদা, তুমি এখন যাও।'

সেই মিনতি যেন ওর কানে যায়নি। নির্লজ্জের মতো, আমার স্বামীর উপস্থিতি অগ্রাহ্য ক'রে আরো কাছে ঘেঁষে আসত। আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে, চুলের রাশিতে চোখ ডুবিয়ে গাঢ় গলায় বলত, 'প্রীতি, আমার কথাটা ভেবে দেখেছ?'

ফিসফিস ক'রে আমি বলতাম, 'কোন কথা?'

'সেই যে-পরামর্শটা দিয়েছিলাম!'

'শয়তান,' আমি বলতাম, 'শয়তান, তুমি পালাও। তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে, তোমার পরামর্শ চাইনে। তুমি পাপ, আমাকে সর্বনাশের পথে নামাতে চাইছ। তোমার কি মায়াও হয় না। দেখছ না আমার পাশে ঘুমন্ত সৌম্য আমার স্বামী, আমাকে সে কতখানি ভালোবাসে। কী বিশ্বাসে স্থির তালে ওর শ্রান্ত বুক ওঠানামা করছে, তুমি বলছ ওকে এখুনি এ-মুহূর্তেই, আমার আঙুলগুলোকে সাঁড়াশির মতো কঠিন ক'রে— তুমি কি পশু! কিন্তু পশুরাও তো বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে।'

অবুঝের মতো সেই ছায়া মাথা নাড়ত। অতি মৃদু, কিন্তু নিষ্ঠুর,

অবিচলিত স্থির গলায় বলত, 'এ ছাড়া আর যে কোনো উপায় নেই, প্রীতি।'

অনেকক্ষণ আমি যন্ত্রণায় কপালের রগ চেপে চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতাম। শেষে ক্লান্ত গলায় বলেছি, 'তুমি জানো না, রতিদা, তোমাকে আরও একটা খবর দিই। উপায় আর আমারও নেই। বাধা আরও আছে।'

'কী বাধা?'

'তাও মুখ ফুটে বলতে হবে? আমার এতটুকু লজ্জাও কি আমার জন্যে রাখতে দেবে না? রতিদা, তুমি পুরুষ, তোমার চোখ নেই, তাই আমার শরীরের পরিবর্তনটা ধরতে পারোনি।'

দৃষ্টিকে সার্চলাইটের মতো তীব্র ক'রে ছায়া চেয়ে থাকত। হয়তো বুঝত না, হয়তো বুঝত, লক্ষণ কয়টি ওর চোখে স্পষ্ট হ'ত। তখন মাথা নেড়ে বলত, 'বিশ্বাস করি না।'

'তোমার অবিশ্বাসে কিছু আসে-যায় না। যা সত্য তাকে কি অবিশ্বাস মিথ্যে ক'রে দিতে পারে? সে আসছে, সত্যিই আসছে। এখন এই মুহূর্তে আমার মধ্যে কাঁপছে। তুমি যাও।'

শিশুর মতো দুর্বল হ'য়ে ছায়া ব'লে উঠত, 'পারব না, প্রীতি, পারব না। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব কী ক'রে।'

আমি বলতাম, 'চুপ। আস্তে। আমার স্বামী উঠে পড়বে। এখন ছাড়তে পারবে না বলছ, কিন্তু একদিন তো আমাকে ধ'রে রাখার সুযোগ তোমারই ছিল, সেদিন কেন রাখোনি?'

'আমি ভুল করেছিলাম।'

'আমার ভুল দিয়ে তোমার ভুল শোধরাতে আমি রাজী নই। তুমি যাও।'

ছায়া মিলিয়ে যেত।

সে-ছায়া রতিদা তো নয়। আমারই ভাবনা। আমার নিভৃত গোপন ইচ্ছাই তাকে টেনে আনত।

ওই ছায়াকে আমি ঠিকই সনাক্ত করেছিলাম।

আসল রতিদাকে আমি ঠেলে রাখতে পারি, কিন্তু আমার মনের ভাবনা যে-রতিদাকে রচনা করে, তার ছায়াকে ডেকে আনে, তাকে আমি ঠেলে রাখি কী ক'রে।

এই ছায়া অগোচরে আমারই সৃষ্টি, কিন্তু আমার অবাধ্য। আমি তারও পিছে-পিছে ছুটতে চাই, আবার বাঁধা প'ড়ে থাকতেও চাই যে।

তাই তো একটার পর একটা শিকল নিজেই তৈরি ক'রে নিচ্ছিলাম।

আমার স্বামীকে ডিঙিয়ে রতিদা হঠাৎ এসে হাজির হ'তে পারে, কিন্তু আমার সন্তান তখন আগলে রাখবে আমাকে। তার মুখোমুখি প'ড়ে সব লোভ জব্দ হবে। সর্বনাশা সব পরামর্শ মূক হ'য়ে যাবে। কোনো হাতছানি আমাকে আর টানবে না।

আমার দেহে একটু-একটু ক'রে পরিবর্তন ঘটছিল, সেই সঙ্গে মনেরও। একটু-একটু ক'রে জোর পাচ্ছিলাম আমি, আমারও সাহসও বাড়ছিল।

স্বামীকে বললাম, 'এবার আমাকে মা-র কাছে রেখে এসো।'

ও অভিমান ক'রে বলল, 'আমাকে একা রেখে যাবে? জানো, আমি একা কোনো কাজ ক'রে উঠতে পারি না। রান্না জানি না, নিজের ভিজে কাপড়টা পর্যন্ত শুকিয়ে নেবার ক্ষমতা আমার নেই!'

অল্প কয়দিন আগেই অসুখ থেকে উঠেছে, ও হাঁপাচ্ছিল। চোখ ছলছল করছিল। আমি ওর গালে হাত রেখে বললুম, 'তুমি একেবারে অবুঝ। আর কিছুদিন এখানে থাকলে আমি নিজেও যে অকর্মণ্য হ'য়ে পড়ব, বুঝছ না? আমার দিকে চেয়ে দেখ তো!'

ও দেখল। হয়তো বুঝল। কেননা, ওর চাউনিতে খুশির ছাপ ফুটে উঠতে দেখলুম। সেদিনই অফিসের পরে ও আমাকে মা-র ওখানে রেখে এল।

রতিদা আমাকে দেখল, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। ঈর্ষা মানুষকে বড়ো ছোটো করে। রতিদাকেও ছোটো করল, আমার চোখে।

রতিদা বলল, 'ইস! গর্ব যে আর ধরে না!'

'গর্ব তুমি আবার দেখলে কোথায়?'

'তোমার সর্বাঙ্গে। সৌভাগ্যে স্বাস্থ্যে তুমি ফেটে-ফেটে পড়ছ। তোমার কপাল সিঁদুর-মাখা, চুল জবজবে, চোখ দুটি জ্বর-বিকারের রুগীর মতো টসটস করছে, আর শরীর থপথপে। নিজেকে তুমি কি আয়নাতেও দেখ না?'

দেখতুম। আমার জানলার বাইরেই একটা নোংরা জলের খোলা নালা, তার পাশে আমাদের ঘরের ছায়ায় একটা শূকরী তার থলথলে শরীর নিয়ে দুপুরে জিরোত। তার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতুম আমি। ওর সঙ্গে কোথায় যেন আমার মিল আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্যের চোখ দিয়ে, অন্য লোক হ'য়ে গিয়ে, বিচার করতাম নিজেকে। ভরা-ভাদ্র শরীরটাকে। 'পারে না বহিতে নদী জলভার'— এ কি তারই বর্ণনা?

একটু-একটু ক্লান্ত হতাম আমি, অল্পেই হাঁপাতাম, আমার মাথা ঘুরত। সব আবরণ ঢিলে ক'রে না দিলে স্বস্তি হ'ত না। বাথরুমে গিয়ে খালি ঘটি-ঘটি জল মাথায় ঢালতাম।

মা বলত, 'অত জল ঘাঁটিসনে। কবে একটা অঘটন বাধিয়ে বসবি—'

সেই অঘটনই একদিন ঘটল। পা পিছলে কলতলাতে প'ড়ে গেলুম।

মুহূর্তে সব যেন অন্ধকার হ'য়ে যেতে থাকল। প্রাণভয়ে চিৎকার ক'রে মাকে ডেকেছিলুম মনে আছে। আর কিছু মনে নেই। প্রবল একটা স্রোতে আমি ভেসে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি।

আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলুম।

গলা অবধি শাদা চাদরে ঢাকা, আমি শুয়ে ছিলুম। আমার হাত দুটি বুকের উপরে রাখা, দেখছিলুম। হলদে, সরু-সরু আঙুল। আমি এতটা ফর্সা ছিলুম কবে।

রতিদা আমাকে দেখতে এসেছিল।

আমার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল। হাতের ইশারায় ওকে ডাকলাম। কাছে বসতে বললাম।

ও ইতস্তত করছিল, আমি বললাম, 'এসো না, রতিদা! আজ আমার গর্ব নেই, দেখছ না? সংকোচও নেই।'

রতিদা আমার একখানা হাত তুলে নিল। 'ইস, কী রোগা হ'য়ে গেছ! একেবারে কাগজের মতো শাদা?'

বললাম, 'বাধা থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে, অমন অনেক দামই দিতে হয়।'

রতিদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। দেখি, ওর চোখের পাতা দপদপ করছে।

সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলুম, আমার কথার ও ভুল মানে করেছে। ইচ্ছে ক'রে আমি পথের বাধা দূর করেছি, রতিদা এটাই ধ'রে বসল না তো?

আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। চোখ বুঁজেও আমি থেকে-থেকে শিউরে উঠছিলুম। ফিরে যেতে চাইছিলুম সেই মুহূর্তটিতে, যখন আমি পা পিছলে কলতলায় প'ড়ে যাই।

সেই উজানে ফেরা সহজ না। তীব্র জলস্রোত মুখে এসে লাগে, ফেনায়

শরীর ঢেকে যায়, আর ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝে-যুঝে ক্লান্ত হ'য়ে পড়তে হয়। আরও তলিয়ে যাই, ভাটির দিকে আরও হ'টে আসি।

উজানে ফিরব কী ক'রে।

যদি ফিরতে পারতাম, যদি এক লহমার জন্যেও আবার বাঁচতে পারতাম সেই মুহূর্তটিতে, যখন আমার চোখের সামনে থেকে পৃথিবী হঠাৎ লুপ্ত হ'য়ে গেল, অন্ধকার গহ্বরে কে টেনে নিয়ে গেল আমাকে, টানল, আমাকে কেবলই নিচে টানল, তবে আমি জানতেও পারতাম, কী ক'রে ওই ঘটনাটা ঘটেছিল।

সত্যিই কি ওটা দৈব-দুর্ঘটনা, নাকি রতিদা যা সন্দেহ করেছে তাই! আমি কি ইচ্ছে ক'রে—

অসম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি এসব ইচ্ছে থাকে গর্ত খুঁড়ে, নির্বিষ হ'য়ে, তারপর সুবিধা-সুযোগমতো বেরিয়ে আসে।

হয়তো রতিদার কথাই ঠিক। হয়তো আমারই গোপন মন রেহাই পেতে চাইছিল। আপন সন্তান যারা এভাবে নষ্ট করতে চায়, শুনেছি তারা ভ্রষ্ট স্ত্রীলোক— আমিও কি তাদের মতো?

এই প্রশ্নটা আমাকে পাগল করেছিল। আমি দিনকতক কেমন হ'য়ে গিয়েছিলাম। কিছু শুনতাম না, বুঝতাম না, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকতাম। চুলে তেল দিইনি, গা ধুইনি। আমার হাতে আর পায়ে খড়ি উড়েছে, আমি ভালো একটা শাড়িও নাকি পরিনি।

নখ কাটতাম না; মা বলে, আমি নাকি তাই দিয়েই আমার মুখ-বুক আঁচড়ে-আঁচড়ে রক্তাক্ত ক'রে তুলতাম। বলে, আমি নাকি তখন পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম।

মা জানে না। ওরা কেউ জানে না। আসলে আমি আঁচড়াতে চাইতাম আমার মন। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে সত্যটাকে খুঁজতাম।

যে আসবে ব'লে আমার শরীর ভরেছিল কানায়-কানায়, সে এলে আমার জীবনও হয়তো ভ'রে উঠত। কোনো পাপ, কোনো প্রলোভন আমাকে হয়তো আর টানতে পারত না। আসতে চেয়েও সে কেন এল না। নাকি তাকে আমিই আসতে দিইনি ?

রতিদা রোজ আসত। আমাকে স্পর্শ করত।

বাধা দিইনি। দেব কী ক'রে। আমার সব জোরটাই যে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল।

আসত আমার স্বামীও। সে-ও আমাকে স্পর্শ করত। আমি কাঠের মতো প'ড়ে থাকতাম। মনে-মনে বলতাম, 'পালাও, আমার নাগালের বাইরে পালাও তুমি। এবার তোমার পালা, তোমার ভয় করে না ?'

আমি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেও উঠেছি এক-একবার। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি এ চাইনি। আমি একটি শান্তির নীড়ই মনে-মনে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, যা হবার তা তো হয়েছে, এবার একটি ছোট্টো সংসার আমাকে আবৃত ক'রে রাখুক। কিন্তু নিয়তির লেখা আমি প'ড়ে নিয়েছি। তা আর হবার নয়। রতিদা আমাকে টেনে নেবেই। পথের বাঁকে গুপ্ত আততায়ীর মতো সে অপেক্ষা ক'রে আছে। স্বামীর ঘরে আমি ফিরব সন্দেহ নেই।

এও জানি, আমার ভাঙা দেহ আবার ভরবে, কিন্তু ভাঙা মন আর জোড়া লাগবে না।

আর তার চেয়েও যা ক্ষতি হ'ল আমার, লিখে কি তা বোঝাতে পারব ? আমার ঘরনী-মনটাকেই যে একটি দুর্ঘটনা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল।

আমি ওকে বুঝি এখন থেকে শুধুই ঠকাব।

ভালোবাসার ভান করাও আমার পক্ষে শক্ত হবে। আর আমি আরও নিচু, আরও ছোটো হ'য়ে যাব। দুর্বল অসহায় একটি মানুষ সর্বতোভাবে

আমার ওপরই নির্ভর ক'রে আছে, তাকে ঠকাতে আমার ভিতরটা ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে, কিন্তু উপায়ও যে নেই।

মরণ তো ওইখানেই। আমার হাত আমার পা দুখানা আমার। এদের নিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি, নাড়াচাড়া করতে পারি যেভাবে খুশি, কিন্তু আমার মনের উপর আমার কোনো হাত নেই।

সে যে শুধু নিজের মতো চলে তাই নয়, আমাকে চালায়।

শিশুর মতো অসহায় স্বামীকে সে করুণা করতে শেখায়, তার প্রতি মায়াও আনে, কিন্তু ভালোবাসতে দেয় না।

স্বামীর মৃত্যুও কি আমিই কামনা করেছিলাম? কী জানি, আজ আর আমি কিছু অস্বীকার করি না।

প্রথমে হয়তো ইচ্ছাটা ছিল নিরীহ শ্বাপদ-শিশু। তার দাঁত-নখ কিছুই ফোটেনি। তাকে লালন ক'রে বাড়িয়ে তুললাম বুঝি আমিই।

বাঘিনী যেমন তার খরখরে জিভ দিয়ে তার বাচ্চাদের দেহ লেহন ক'রে তাদের পরিচ্ছন্ন ক'রে তোলে, আমার ইচ্ছা-শিশুটাকে আমি তেমনই লালা-রসে ভিজিয়ে সতেজ ক'রে তুললাম।

সেই ইচ্ছাটা কি ও টের পেয়েছিল?

তার সঙ্গে যুঝে উঠতে পারবে না জেনেই কি ও এত তাড়াতাড়ি মরল? জানি না।

আমার স্বামীর মৃত মুখচ্ছবি মনে আছে। ওর নিস্পন্দ হাতে একটি মুদ্রা স্থির হ'য়ে ছিল। আমার স্বামী যেন ইঙ্গিতে ব'লে দিয়ে গেল, 'তোমার প্রার্থনা আমি পূরণ করলাম। আমার প্রতি আর কোনো দ্বেষ মনে রেখো না। তুমি সুখী হও।'

রতিদা অবাক হ'য়ে আমার সিঁথির দিকে চেয়ে ছিল। আমি অল্প

একটু হাসলাম। হাসল সে-ও। দু-জনেই অকারণ। বললাম, 'চেয়ে-চেয়ে দেখছ কী। ফিরে এলাম।'

ও বলল, 'তাই দেখছি।'

কথার সুরটা আমার ভালো লাগল না। একটু কি ব্যঙ্গ ছিল রতিদার ভঙ্গিতে? একটু বিদ্রূপ? অথবা সন্দেহ?

এ-কথা ও-কথার পর রতিদা বলল, 'কী হয়েছিল তোমার স্বামীর?'

'নিউমোনিয়া।' আমি বললাম।

'কই, অসুখের কথা শুনিনি তো?'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'ও বেশিদিন ভোগেওনি। ঠাণ্ডা লাগিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরল, রাত্রে জ্বর হ'ল, জ্বর বাড়ল, পরদিন বেহুঁশ হ'য়ে ছিল, তারপর তৃতীয় দিনেই—'

'ডাক্তার ডাকোনি?'

'ডেকেছি বৈকি। কেন?'

রতিদা বলল, 'না, এমনি।'

আর তখনই আমার সন্দেহ হ'ল, আমাকে আগেরবারের দুর্ঘটনার মতো এবারও ও সন্দেহ করছে। ক্রোধে ঘৃণায় আমি রুদ্ধবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম। ভাবছিলুম, ঝাঁপিয়ে পড়ি ওর ওপরে, ওকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলি। ওকে বুঝিয়ে দিই, ও একটা আস্ত শয়তান হ'তে পারে, কিন্তু আমি শয়তানী নই।

কিন্তু না, সভ্য মানুষ না আমরা? আমরা জোরে কথা বলি না, আর যা বলি, তাও মনের কথা নয়।

রতিদার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেলুম একদিন। মা পাঠিয়ে দিল। বলল, 'তোর মন ভালো হবে।'

রতিদাই আমাকে নার্সিং-এ ভর্তি ক'রে দিল। বলল, 'প্রীতি, তোমাকে

নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমি শুধু তোমাকে চাই না, তোমার ভালোও চাই।'

কোনো বাধা ছিল না ব'লেই কি ওর আকর্ষণ ক'মে আসছিল? পৌনঃপুনিকতা আর পুনরাবৃত্তির জন্মে সব আচরণই কি ওর কাছে লাগছিল ফিকে আর জোলো?

কী জানি। তাই বুঝি আমার সঙ্গে সামান্য কারণেই ও ঝগড়া করল। ক'রেই নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল, ফিরল নোলক-পরা একটি বউ সঙ্গে নিয়ে?

নিজের মন রতিদা বুঝি নিজেও জানে না।

কিন্তু আমি কিছুটা জানি। আজ যে আবার ও খেপে উঠেছে, আমাকে নতুন ক'রে পাবার জন্য ও যে ব্যাকুল, সে তো শুধু বাধা আছে ব'লেই।

বাধাটা ও দূর করবেই। মণিকাকে ও সরাবে। ওর সংকল্প আমি টের পেয়েছি।

শুধু উপায়টা স্থির করতে পারছে না ব'লেই যা দেরি। আর আমার নৈতিক সমর্থন পাচ্ছে না ব'লে। আমি জানি।

### তিন ॥ রতীনের কথা

মণিকা, আমি তোমাকে মারতে চেয়েছিলাম। তোমার ওষুধের শিশিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, অকপটে সব স্বীকার করছি।

না, ওভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকো না। তোমার ওই ঠাণ্ডা দৃষ্টিকে আমি ভয় করি। ওই দৃষ্টির উপাদানগুলি আমি মনে-মনে বিশ্লেষণ করেছি। ঘৃণা, তিরস্কার, অভিযোগ সব মিলে তোমার চোখ সলতের মতো জ্বলছে। তোমার চোখ দুটি বন্ধ করো, আমি স্বস্তি পাই, বাঁচি।

মণিকা, তুমি হয়তো আজ আমাকে পিশাচ বা ওইরকম কিছু একটা ভাবো। কিন্তু ঠিক পিশাচ বোধ হয় আমি নই। মানুষ, মানুষ। মানুষ ব'লেই তো নিজের দুর্বলতা, লোভ— সত্যি কথা বলতে কি ষড়রিপুর প্রায় কোনোটিকেই জয় করতে পারিনে।

আমার মনেরও আমি নাগাল পাইনে। কেবল এইটুকু জানি সে আছে। আমারই এই শরীরটার ভিতরে হৃদিস্থিত হৃষীকেশ হ'য়ে আমাকে তার একান্ত বশংবদ আজ্ঞাবাহী ক'রে তুলেছে। সে যা বলে আমি তাই করি। এই মনের ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলা কি সহজ ?

আজ আর লুকোব না। তুমি নিজেও টের পেয়েছিলে প্রীতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহজ নয়। প্রথম থেকেই তার মধ্যে জটিলতা ছিল। তুমি প্রশ্ন করতে পারো, সেই জটিলতাকে আরও জটিল ক'রে তুললাম কেন।

এ-প্রশ্নের জবাব নেই। কিংবা যদি থাকে তো আমার জানা নেই।

প্রীতি যখন কিশোরী তখনই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হই। যতদিন না তার মনের কথা আমার জানা হ'য়ে গেল ততদিন সে-আকর্ষণ জোয়ারের জলের মতো আমার স্নায়ু, শিরা, শরীরের যত খাঁড়ি সব ভ'রে দিত। সে-জলের সবটা নির্মল ছিল না। সেই তোড়ের মুখে কোনো সচেতন সজ্ঞান ইচ্ছাও ছিল না। ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খেতে-খেতে অনেক লোনা জল পেটে পুরে আমি তলিয়ে যেতুম।

আশ্চর্য, ভাঁটার টান শুরু হ'ল যেদিন প্রীতিও আমাকে চায় এ-কথা প্রথম জানলাম।

মণিকা, উপভোগে নয়, শুধু অপর পক্ষের সাড়াতেই যার কামনার উপশম তার মনকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে তুমি পারোনি। এমন চরিত্র কখনও দেখেছ, সামনে অবাধ মসৃণ পথ দেখে যে ধপ ক'রে ব'সে পড়ে ? পথ-পরিক্রমার সামান্য ইচ্ছাটুকুও যার থাকে না ? আবার যদি

দেখে সেই পথে বাধা অমনি সে রোষে ফুলে ওঠে। ভাবে, এই তুচ্ছ বাধাটা অতিক্রম তাকে করতেই হবে।

অন্যত্র প্রীতির বিয়ের আয়োজন তাই আমাকে যথোচিত আঘাত দেয়নি। বরং এই ভেবেই আমি মনে-মনে উল্লসিত হয়েছিলুম যে আমাদের সম্পর্কটা আলুনি হ'য়ে আসছিল এবার তাতে স্বাদ বাড়বে।

আবার দেখ, যখনই প্রীতি পরহস্তগত তখনই আমার সর্বনাশা রোখটা যেন আবার জেগে উঠল।

ওর স্বামীকে আমি যে অপছন্দ করতুম সেটা সে আমাদের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছিল ব'লে, অন্য কোনো কারণে না। আমার ইচ্ছাকে সেদিন আমি চিনেছিলাম। সেই ইচ্ছা সূচ্যগ্র হয়েছিল, আর সেই সূচী-মুখে ছিল বিষ। আমি নিরন্তর কামনা করেছি, ওর মৃত্যু হোক। প্রীতি আবার আমার হ'য়ে ফিরে আসুক।

কী জানি, প্রীতি হয়তো সংসারী হ'তে চেয়েছিল। ছোটো একটি ঘর, তার স্বামী, সন্তান, সুখী একটি সংসার। প্রীতির এই ইচ্ছাটা যে-মুহূর্তে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে, সেই মুহূর্তে একটা তীব্র ঈর্ষা আমায় দগ্ধ করেছে। ভেবেছি ভেঙে-চুরে সব তছনছ ক'রে দেব। আমার রগে-রগে আক্রোশ স্ফীত হ'য়ে উঠেছে। অভিশাপে এ-কালে কোনো অমঙ্গল ঘটে না, কিন্তু প্রীতির স্বামীর বেলায় কি ঘটেছিল? আজও আমি ধারণাটা উড়িয়ে দিতে পারিনি যে প্রীতির যে-সন্তানটি গর্ভেই নষ্ট হ'ল তার জন্য দায়ী সে নিজে। সচেতন মনে না হোক, অবচেতন মনে। আমার সঙ্গে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার মনে জ্ব'লে উঠে থাকবে। দুটি জীবন হয়তো তাতেই ভস্মীভূত হ'ল।

প্রীতি এল কিন্তু তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারলাম কই? নেশার মতো ক'দিন কাটল। কতদিন সিনেমায়, চায়ের দোকানে অথবা কোনো

নিভৃত বাগানে প্রীতি আমার কানে-কানে বলেছে, 'আমি তোমার, এখন থেকে শুধু তোমার।' সেই গদগদ প্রেমের বুলিও একদিন আমার কানে ফাঁকা শোনাল। বাধা নেই এমন প্রেম নিয়ে আমি করব কী?

আমার মনের এই প্রশ্নটা, এই দ্বন্দ্ব যেন মৈত্রেয়ীর সেই ধ্রুপদী জিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি। আমি নিশ্চিতভাবে টের পেলাম আমার আসক্তি জলে নয়, সুরায়। জল, শুধু জল দেখে-দেখে আর চেখে-চেখে আমার চিত্ত বিকল হ'য়ে উঠেছে।

মণিকা, আমি তাই তো তোমাকে নিয়ে এলুম। একটি নিরপরাধ মেয়েকে শুধু আমার জীবনের স্বাদ বাড়ানোর মসলা হিসাবে ব্যবহার করেছি এই গ্লানি আমার যাবে না।

যা চেয়েছিলাম তাই হ'ল। আমাদের সম্পর্কটা তোমার চোখে ধরা পড়তে দেরি হ'ল না। তুমি সন্দেহ করতে শুরু করলে, আর আমি শুরু করলুম তোমাকে ঘৃণা করতে। অবোধ বালিকা, নিজের নিয়তি তুমি নিজেই ডেকে এনেছ। কেন তুমি আমাদের সন্দেহ করলে, করলে যদি সেই সন্দেহকে লুকিয়ে রাখতে পারলে না কেন।

আমার আর প্রীতির মাঝখানে পাথরের দেয়াল হ'য়ে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে। একে আত্মহত্যার সাধ ছাড়া আর কী বলব।

মণিকা, মনে আছে একদিন রাত্রে খুব ঝড় উঠেছিল? ঝড় থামল, আমার বুকে মাথা রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। আমি পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এসেছিলুম, উঠে গিয়েছিলুম ছাদে। সেখানে প্রীতি ছিল। কিন্তু তুমি তো ঘুমওনি, ঘুমটা তোমার ভান। তুমিও উঠে এলে। আমাদের মধ্যে তোমার ছায়া পড়ল। চকিত হ'য়ে আমরা স'রে দাঁড়ালুম কিন্তু আমার মনের কঠিন কুৎসিত সংকল্পটা সেদিনই জন্ম নিল।

তোমাকেও সরিয়ে দিতে হবে।

আমার এই ইচ্ছাটা তোমার চোখেও বুঝি ধরা প'ড়ে গেছে। তুমি আমাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলেছ। এড়িয়ে চলেছ কিন্তু পালাওনি। কেন? মৃত্যুকে ত্বরিত করবার জন্য তোমার আগ্রহ হয়েছিল কেন?

যে-সুযোগ খুঁজছিলুম, সেই সুযোগ একদিন এল। অসুস্থ হ'য়ে তুমি বিছানা নিলে। ডাক্তার এল, ওষুধ এল। সেই ওষুধেই—

থাক, এত খোলাখুলি লেখার প্রয়োজন নেই। তুমি তো সবই বুঝেছ।

ঘুম থেকে তুলে তোমার মুখের কাছে ওষুধের গ্লাস ধরলুম। আমার গলায় হাত জড়িয়ে মাথা তুলে তুমি সবটা ঢকঢক ক'রে খেয়ে নিলে। খেয়েই তোমার মুখ বিকৃত হ'য়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে বললে, 'এত তেতো। মাগো, এ কি বিষ?'

'না, ওষুধ।'

আমি আবার আলগোছে তোমার মাথা শুইয়ে দিলুম বালিশে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখতে থাকলুম।

প্রথমটা আচ্ছন্নের মতো প'ড়ে ছিলে। তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বসলে বিছানায়। তোমার মুখ নীল হ'য়ে গেছে, সমস্ত শরীর কঠিন। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছ।

আমি ভয় পেলাম। এক-পা এক-পা ক'রে পিছু হটলুম। পিঠ দিয়ে দাঁড়ালুম দেয়ালে। তোমাকে আমিও একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে থাকলুম।

উঠে বসেছিলে আবার ধপ ক'রে শুয়ে পড়লে বিছানাতেই। বালিশগুলোকে একটা-একটা ক'রে ছড়িয়ে দিলে। ছুঁড়ে দিলে মেজেতে, হয়তো আমাকেই তাক ক'রে।

আমার গায়ে লাগেনি, আমি তখনও তোমাকে দেখছিলুম।

দেখছিলুম তোমার হাতের সরু আঙুলগুলো, দেখতে-দেখতে বাঁকানো আঙুলটির মতো হ'য়ে গেল। তোমার ধারালো দাঁতে চেপে ধরা ঠোঁট বেয়ে

রক্তের ধারা নামল। একটু পরে কষে আর রক্তে মাখামাখি হ'য়ে গেল।

তোমার নরম শরীরটা কুঁকড়ে দুমড়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। মুখে রাশি-রাশি ফেনা, ওথলানো ডেকচির কানায়-কানায় যেমন থাকে।

তুমি কষ্ট পাচ্ছ। তুমি ম'রে যাচ্ছ। আমি দেখছি।

হাতের বাঁকানো আঙুলগুলো দিয়ে তুমি আমাকে ডাকলে। আমি যেভাবে পিছিয়েছিলুম, সেইভাবেই পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলুম তোমার দিকে। আদিম হিংস্র বন্য আক্রোশে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার বুকে। লজ্জা নেই, আবরণ নেই, তোমার সেই বাঘিনীর মতো আরণ্য রূপ আমার দেখতে ভালো লাগল। যেন নেশা লেগেছে, চোখ আর ফেরাতে পারছিনে।

জড়িত গলায়, স্পষ্টভাবে কথা বলার শক্তি তখন তোমার রহিত হ'য়ে এসেছে— আমাকে কেবলই বলতে থাকলে, 'কী খেতে দিয়েছ তুমি আমায়, বলো, বলো, বলো।'

আমি জবাব দিইনি, আস্তে-আস্তে তোমার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। হাতের কাছে ছিল জলের জার। সেটাকে তুলে তুমি ঢেলে দিলে তোমার বুকে। কাতর গলায় বললে, 'জ্ব'লে যাচ্ছি, জ্ব'লে যাচ্ছি।' কিন্তু বাইরের জলে কি ভেতরের জলুনি নেবে?

তুমি দাপাদাপি করছিলে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিলে মেজেয়, যন্ত্রণায় ছটফট করছিলে। তোমার ঠোঁটে রক্ত, তোমার মুখে ফেনা আর কষ। সে-ব্যথার উপশম করতে আমি কি এগিয়ে গিয়েছি?

কই না, মনে পড়ে না তো।

আমি যে জানতাম এই দাপাদাপি থামবে। তুমিও থামবে। আমি কি সেই মুহূর্তেরই অপেক্ষায় ছিলুম? হাতঘড়িটা কানের কাছে তুলে সময়ের মাপ নিচ্ছিলুম? মনে পড়ে না।

আসলে আমি নিজেই সে-সময় কী করেছি আমার নিজেরও তা মনে নেই।

ঠিক তখনই ডাক্তার এল। আমি অবাক হইনি, ডাক্তারকে খবর দিল কে, একবারও মনে এই প্রশ্নটা ওঠেনি। আমি তার পথ ছেড়ে দিয়ে স'রে দাঁড়ালুম, যেন সে আসবেই আমি জানতুম। সেই মৃত্যুবাসরে যা-যা ঘটছিল সবই যেন পূর্ব-নির্ধারিত, পূর্ব-পরিকল্পিত।

হয়তো ডাক্তারকে প্রীতিই ডেকে এনেছিল। সে যে উঁকি দিয়ে কখন এই ঘরটা দেখে গেছে, আমি কিছুমাত্র টের পাইনি।

এখন ভাবি, প্রীতি ডাক্তার ডেকে এনেছিল কেন? তুমি তো তার প্রতিদ্বন্দ্বী, পথের কাঁটা। তোমাকে বাঁচানোর শখ তার হ'ল কেন? জানিনে। হয়তো সে ভেবে থাকবে, তোমার আয়ু যতক্ষণ তার প্রেমের আয়ুও ততক্ষণ। যে-মুহূর্তে তুমি স'রে যাবে, সেই মুহূর্তে আমাদের সম্পর্কটা আবার সেই পানসে আর ফিকে হ'য়ে যাবে। নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ তাতে থাকবে না।

মমতা নয়, প্রেমকে বাঁচাতে গিয়েই কি প্রীতি তোমাকে বাঁচাতে চাইল?

কিন্তু মণিকা, তুমি বাঁচলে কই।

যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সবটুকু শক্তি প্রয়োগের ফলে যা বাঁচল, তা শুধু তোমার প্রাণই। তুমি বাঁচলে না।

তুমি দেখনি, মণিকা, ডাক্তার সেদিন কী সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে বারবার চাইছিল!

'ওষুধের ওভারডোজে এতদূর হ'ল? বড়ো মারাত্মক ওষুধ তো!' ডাক্তার মন্তব্য করেছিল। দেখতে চেয়েছিল শিশিটা।

শিশিটা ওর হাতে তুলে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। আসামী যেভাবে রায় শোনবার প্রত্যাশায় জজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবে।

শিশিটা শুঁকল ডাক্তার, চোখ একবার বড়ো-বড়ো ক'রে, পরে কুঁচকে শিশিটার রং দেখল। না, সন্দেহজনক কিছু সে পায়নি। পাবার সম্ভাবনাও ছিল না। আমি অত কাঁচা কাজ করিনি।

আমার হাতে শিশিটা ফিরিয়ে দিয়ে ডাক্তার বলল, 'নাঃ, ঠিকই আছে।'

স্পষ্ট টের পেলাম, ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। ওর হতাশায় আমি কৌতুক বোধ করেছিলাম।

আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর ডাক্তার কপালের ঘাম মুছে বলল, 'আর ভয় নেই।'

কাকে অভয় দিয়েছিল ডাক্তার? আমাকে? আমি কি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম? আমি কি একপাশে দাঁড়িয়ে সেদিন ঠকঠক ক'রে কেঁপেছি? আমার মুখে তখন কি বিন্দুমাত্র রক্তও ছিল? আমার তখনকার মুখের ছবি যদি কেউ এঁকে রাখত তবে বেশ হ'ত।

কোনো খুনী, কোনো চক্রীকে কখনও তো চোখে দেখিনি, ছবিটা থাকলে একেবারে মুখোমুখি মোলাকাৎ হ'ত।

মণিকা, তুমি শান্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছিলে।

আমি ঘুমইনি, ঘুমতে পারিনি, ঘুমনো আমার বারণও ছিল।

ডাক্তার হুকুম দিয়েছিল, সারারাত জেগে তোমাকে পাহারা দিতে। মাঝে-মাঝে নাড়ি ধ'রে পরীক্ষা করতে: গতি দ্রুত, না মন্দ।

বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, মণিকা, আমি অপলক দৃষ্টিতে তোমাকে দেখছিলুম। কী অপরূপ তোমাকে যে লাগছিল!

তুমি সুন্দর, কিন্তু এত সুন্দর, অন্তত আমার চোখে, কখনও তো ছিলে না ! তোমাকে আর কখনও তো এত বরণীয়, এত কাম্য মনে হয়নি। মণিকা, সেই মুহূর্তে, মধ্যরাত্রির লোহিতাঙ্গ জ্বলজ্বলে গ্রহটিকে সাক্ষী রেখে আমি তোমাকে ভালোবাসলাম।

তোমাকে এত সুন্দর করল কে ? মৃত্যু ? কিন্তু মৃত্যু তো আসেনি। তোমার দেহের আঙিনায় ছায়ামাত্র ফেলে সে স'রে গেছে।

মৃত্যুর ছায়াই এত সুন্দর ? সম্পূর্ণ মৃত্যু তা হ'লে না জানি কত—

সেই মুহূর্তে আমারও মৃত্যুর সাধ হয়েছিল।

আমি কেবলই ভাবছিলাম, তোমাকে একটু ছুঁই। তোমার শীতল ঠোঁট, তোমার নিমীলিত চোখ, তোমার কর্ণমূল। তোমার কয়েকটি চুল আমার আঙুলে জড়াই। জড়াই, জড়াই, জড়াই। তারপরে মরি।

অতি মৃদু তালে তোমার শ্বাস পড়ছিল। একবার তুমি নড়লে। একবার চোখ মেলে আমার দিকে তাকালে। তারপরে হঠাৎ তোমার মুখ কঠিন, বিকৃত হ'য়ে গেল। তুমি তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজলে। আমি তাড়াতাড়ি কাছে গেলুম। স্পর্শ করলুম তোমাকে। বললুম, 'কী কষ্ট ?'

স্পষ্ট বুঝলাম, তুমি যেন আমাকে ঠেলে দিচ্ছ। আমার সান্নিধ্যকে তুমি ভয় পেয়েছিলে।

অথচ তোমাকে আমি সেদিন ভালোবেসেছিলুম।

মণিকা, প্রীতির সঙ্গে পরদিন সকালে আমার দেখা হয়েছিল। ও কী কাজে যেন আমার ঘরে এসেছিল। তোমাকে দেখল। তুমি তখনও ঘুমুচ্ছিলে। প্রীতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। যদিও ও সব জানত।

আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম, 'কাল রাত্রে হঠাৎ ওর শরীর খুব খারাপ হ'য়ে পড়ে।'

প্রীতি নির্বিকার গলায় বলল, 'তাই নাকি!' কিন্তু ওর চোখ দুটি আমাকে বারবার বলছিল, 'খুনী, পাপী, পশু কোথাকার! মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী!'

বলুক, ওর ভুল,ভাঙানোর জন্যে আমার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা ছিল না। আমি যে নতুন ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছি। তোমার ভালোবাসা। তোমাকে ভালোবাসা।

বেলা বাড়ল। তোমার ঘুম ভাঙল। তোমাকে তাকাতে দেখে তোমার কাছে গেলুম। মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললুম, 'কিছু খাবে?'

তুমি চেয়ে রইলে। তোমার ঠোঁট দুটি একবার বুঝি ন'ড়ে উঠতে চাইল, কিন্তু পারল না। নিপুণ ভাস্করের হাতে খোদাই-করা অনেক রমণীয় পাথরের মূর্তি দেখেছি। আজ সেই কঠিন সৌন্দর্যের নমুনা আমারই ঘরে দেখলুম। একটি নিষ্কম্প শরীর যে তার বড়ো-বড়ো বিস্মিত ব্যথিত হয়তো বা চকিত চোখ মেলে চেয়ে থাকে। চেয়েই থাকে।

আবার বললুম, 'কিছু খাবে? মণিকা, খুব কি ক্লান্ত লাগছে?'

তোমার চোখের পাতা শুধু একবার পড়ল। তুমি চেয়ে রইলে।

আমার ভালোবাসার সঙ্গে তখন ভয় মিশল। আমি আস্তে-আস্তে তোমাকে ঠেলতে লাগলাম।

তুমি এবারে নড়লে, নিজে থেকে নয়, আমারই হাতের জোরে।

আমার ভয় করছিল, ভাবনা হচ্ছিল। তুমি কি কানে শুনছ না, শ্রুতিশক্তি একেবারে কি লোপ পেয়ে গেছে?

আমি আবার ঠেললুম।

এবার তোমার চোখে স্পষ্ট আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠল। তুমি চেঁচিয়ে উঠলে, কিন্তু কথা ফুটল না। গলা চিরে একটা গোঙানি আর্তস্বর ফুটল শুধু।

বিষের ক্রিয়া তোমাকে তবে বুঝি শুধু শ্রুতিহীন করেনি, তোমার জিহ্বাকেও জড় ক'রে দিয়ে গেছে।

তখনও টের পাইনি। শুধু শ্রুতি নয়, রসনা নয়, তোমার সব ইন্দ্রিয়ই পাথরের মতো নিথর হ'য়ে গেছে। তফাৎ এই, পাথরের প্রাণ নেই। তোমার প্রাণ আছে কিন্তু প্রাণের প্রমাণ নেই।

অপলক ভীত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে থাকা, হৃৎপিণ্ডের তালে-তালে বুকের অতি মৃদু তালে ওঠা-পড়া আর মাঝে-মাঝে আর্ত গোঙানি, একে কি প্রাণ বলে ?

জিজ্ঞাসা করলুম, 'উঠেও কি বসতে পারবে না ?'

জিজ্ঞাসা ক'রেই বুঝলুম প্রশ্ন বৃথা। তুমি তো শুনছ না। তখন আমি নিজেই তোমাকে তুলে ধরলুম, ধুইয়ে দিলুম মুখ। আস্তে-আস্তে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলুম।

ডাক্তারের নির্দেশ ছিল তাই খানিকটা গরম দুধও নিয়ে এসেছিলুম। তুমি গিলতে পারোনি। দুধের প্রায় সবটাই ছড়িয়ে-গড়িয়ে বিছানা, তোমার জামা ভিজিয়ে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ভয়ে-ভয়ে তোমাকে আবার শুইয়ে দিলুম, তুমি জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলে।

একবার লোভ হ'ল, তোমার বুকে হাত বুলিয়ে ব্যথাটার উপশম ক'রে দিই, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। মনে হচ্ছিল, তুমি যেন মানুষ নও, একগুচ্ছ আঙুর। ছুঁতে গেলেই ঝ'রে পড়বে।

তোমার চোখের কোলে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল। সেই জল নামল ক্ষীণ, অদৃশ্যপ্রায়, সুতোর মতো ধারায়। তোমার চোখের জলও তবে বেঁচে আছে !

ওই জলের ধারা তোমার প্রাণের আর-একটি চিহ্ন। আমি আমার কাপড়ের খুঁট দিয়ে সেই ধারাটি মুছে দিলুম।

মণিকা, এমন আনন্দ এর আগে জীবনে কখনও পাইনি।

তোমার এত কাছাকাছিও বুঝি কখনও আসিনি। দেহগত অতি-নৈকট্য দিয়ে যেরকম আনন্দ আহরণ করেছি, আজকের এই আনন্দের পাশে তাও যেন ফিকে হ'য়ে গেল।

পরদিন সকালে ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলুম। বিধিমতো পরীক্ষা ক'রে সে আমার দিকে চাইল। তার মুখে দুশ্চিন্তার কয়েকটি রেখা ফুটে উঠেছে। বুঝলুম আকস্মিক আতঙ্কে, দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনায় এবং বিষ-ক্রিয়ার অনিবার্য ফল হিসাবে তোমার স্নায়ুকেন্দ্রে গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছে। বহু পেশী আর ক্রিয়া করে না। হয়তো আর করবেও না। এক কথায় তুমি জড়, আড়ষ্ট, পক্ষাহত।

প্রীতি আর আমি ধরাধরি ক'রে তোমাকে একদিন কলতলায় নিয়ে গিয়েছিলুম মনে পড়ে ? তোমার গায়ে হালকা পলিমাটির আস্তরের মতো ময়লা পড়েছিল। সাবধানতার ত্রুটি ছিল না, তবু হঠাৎ হাত ফসকে ওই কলতলাতেই তুমি প'ড়ে গিয়েছিলে। মুখ বেদনায় বিকৃত হ'য়ে গেল। আর চোখ দিয়ে নামল— সেই পুরনো জলের ধারা। কী অসহায়, কী অক্ষম তুমি!

একটির পর একটি দৃশ্য দেখেছি আর করুণায় মমতায় অনুতাপে আমার ভিতরটা উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। কতদিন দেখেছি তোমার স্থির দুটি ঠোঁটে মাছি এসে বসছে, তোমার চোখের পাতায় ব'সে তোমাকে উত্ত্যক্ত করছে। তুমি কিছু করতে পারছ না। কানের কাছে মশা অনেকক্ষণ গুঞ্জন করলেও তোমার কিছু করবার উপায় নেই। ঘামাচিতে সমস্ত শরীর ভ'রে গেলেও তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করেছ, কিন্তু পাশ ফিরতেও

পারোনি। পাশ ফিরতে পারোনি ব'লেই তো তোমার দেহে চাকা-চাকা ঘা দেখা দিল।

আবার ডাক্তার দেখালুম, সে বলল শয্যাকণ্টকী। তোমার বিছানায় পাউডারের কৌটো উজাড় ক'রে দিয়ে যন্ত্রণা কমাবার চেষ্টা করলুম।

তোমার মুখে কথা নেই, তবু জানি অনুক্ষণ তুমি আমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করো। প্রীতিকে দেখলে তোমার ভ্রূ এখনও বুঝি কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। ঠোঁট নড়ে না, আঙুল নড়ে না, শুধু চোখের ইশারা দিয়ে তুমি যেন তীব্র স্বরে বলো— 'না, না, না।'

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। প্রীতির প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। ছিল, স্বীকার করি, ছিল। একদিন ভালোবাসা মানে আমার কাছে ছিল রূপজ মোহ আর দেহজ তৃপ্তি। সেই অর্থ মুছে দিয়েছ তুমি, মণিকা, তোমার অক্ষমতা আর অপটুতা।

চরম আনন্দের স্বাদ আমি পেয়েছি পরম মমতায়।

আমার চোখ দুটির দৃষ্টিকে এমন বদলিয়ে দিয়েছ ব'লেই তো তোমার প্রতি আমার এত কৃতজ্ঞতা।

এই যে আজ একটু দূরে তুমি শুয়ে আছ। আমি তোমায় দেখছি, তুমিও আমাকে দেখছ।

তীব্র বিষ তোমার দেহযন্ত্রে তার স্থায়ী ক্রিয়া রেখে গেছে। তোমাকে বিকল করেছে। তুমি আজ বাকশক্তিহীন, পঙ্গু। কথা বলো না, বিছানা ছেড়ে ওঠো না। খানিকটা জড় রক্তমাংসের পুঁটুলি।

আমি তোমায় পাশ ফিরিয়ে দিই, তবে তুমি ঘুমও। নিজের হাতে তোমার মুখে গ্রাস তুলে দিই তবে তুমি খাও।

মানুষ আর পশুর, তাই বা কেন, প্রাণী আর জড় জীবনের সীমানায়

তুমি দাঁড়িয়ে আছ। তোমার 'তুমি'টা শুধু অস্তিত্ব মাত্র। সেই অস্তিত্ব শুধু হৃদ্‌স্পন্দ, নাড়ির চাঞ্চল্য, বোবা চোখের তারায়, আর-কিছুই নয়।

সকলের করুণার পাত্রী হ'য়ে তুমি বেঁচে আছ। যে আসে সেই পাশে বসে, তোমার মাথায় হাত বোলায়, আবার মনে-মনে অনুকম্পাও করে। এই মেয়েটা যাকে তার স্বামী ভালোবাসে না, প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলনের পথ প্রশস্ত করতে গিয়ে মারতে চেয়েছিল, নিতান্ত কইমাছের প্রাণ ব'লেই সে বেঁচে উঠেছে।

মণিকা, তোমার এই অক্ষম, অপটু, অসহায় অস্তিত্ব আমার সয় না। এ মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুর। আমি তোমাকে বাঁচাব।

আমার হাতে এই যে ছোটো শিশিটা দেখছ, মণিকা, এর ভিতরে কী আছে জানো? বিষ। এবার আরও কড়া, এবারে আর কোনও ভুল হবে না।

মণিকা, ভয় পেয়ো না, চেঁচিয়ে উঠো না, আমি আর হত্যাকারী নই। তোমার জীবনদাতা।

অভীষ্টলাভের জন্য একদিন তোমাকে মারতে গিয়েছিলুম। আজ তোমার অসহায়তাকে করুণা করেছি, ভালোবেসেছি।

ঘৃণার বশে সেদিন তোমাকে মারতে চেয়েছি, আজ ভালোবেসে তোমাকে বাঁচাব, তোমাকে মারব। এই জীবন-মৃত্যুর নিগ্রহ থেকে তোমাকে রেহাই দেব।

মণিকা, ভয় পেয়ো না।